ভারতের
কমিউনিস্ট পার্টি
(মার্কসবাদী)

কর্মসূচী

★ ১৯৬৪ সালের ৩১শে অক্টোবর থেকে ৭ই নভেম্বর কলকাতায় অনুষ্ঠিত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তম পার্টি কংগ্রেসে গৃহীত।

★ ২০০০ সালের ২০শে অক্টোবর থেকে ২৩শে অক্টোবর তিরুবনন্তপুরমে অনুষ্ঠিত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র বিশেষ সম্মেলনে সময়োপযোগী করে গৃহীত।

১

ভূমিকা

১·১ ভারতীয় জনগণের প্রগতিশীল, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও বিপ্লবী ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার বহন করছে কমিউনিস্ট পার্টি। রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক অক্টোবর বিপ্লবে অনুপ্রাণিত অল্প কয়েকজন দূরচেতা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামী ১৯২০ সালে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলেন। জন্মলগ্ন থেকেই পার্টি পূর্ণ স্বাধীনতা এবং মৌলিক সামাজিক রূপান্তরের জন্য সংগ্রামকে লক্ষ্য হিসেবে ঘোষণা করেছিল। ভারতে শ্রেণীশোষণ ও সামাজিক নিপীড়নমুক্ত এক সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করার জন্য পার্টি শপথ নিয়েছিল।

১·২ বিংশ শতাব্দীর প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিলো সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তির সংগ্রাম, বিশ্বজোড়া গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের সংগ্রাম। সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাবাদের আদর্শের অনুসারী পার্টি ধারাবাহিকভাবে এই সমস্ত সংগ্রামকে সমর্থন করেছে। জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য অর্জন এবং কমিউনিজম প্রতিষ্ঠার চূড়ান্ত লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাবার পথে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের নীতিসমূহকেই কর্মনির্দেশিকা হিসেবে গ্রহণ করেছিল পার্টি। পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতার দাবি প্রথম তোলেন কমিউনিস্টরাই, ১৯২১-এ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের আমেদাবাদ অধিবেশনে এই মর্মে তাঁরা একটি প্রস্তাবও পেশ করেন।

১·৩ কমিউনিস্টরা যেমন পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি জানিয়েছিলেন তেমনই তাঁরা স্বরাজের স্লোগানকেও আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের নির্দিষ্ট কর্মসূচীর মাধ্যমে, জমিদারতন্ত্রের বিলোপ, সামন্ততান্ত্রিক আধিপত্যের অবসান এবং

জাতপাতের অত্যাচার নির্মূল করার মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলিকে যুক্ত করে প্রগতিশীল উপাদানে সমৃদ্ধ করার ওপর জোর দিয়েছিলেন।

১·৪ স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণের পাশাপাশি একেবারে শুরু থেকেই কমিউনিস্টরা শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়নে, কৃষকদের কৃষক সভায়, ছাত্রদের তাদের ইউনিয়নে এবং অন্যান্য অংশকে নিজ নিজ গণসংগঠনে সংগঠিত করার জন্য তাঁদের শক্তিকে নিয়োজিত করেছিলেন। এই প্রয়াসের ফলেই সারা ভারত কিষাণসভা ও নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের মতো জাতীয় সংগঠনগুলি তৈরি হয়েছিল, সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস শক্তিশালী হয়েছিল। প্রগতি লেখক সঙ্ঘ, ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের মতো প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক সংগঠন গঠনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন কমিউনিস্টরা।

১·৫ ব্রিটিশ শাসকরা ভারতে কমিউনিজমকে মুছে ফেলতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল। ক্রমবর্ধমান কমিউনিস্ট গোষ্ঠীগুলির ওপর তারা নির্মম দমনপীড়ন নামিয়ে এনেছিল, বৈপ্লবিক ধ্যানধারণার প্রসার আটকাতে কমিউনিস্ট পত্র-পত্রিকা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল। কমিউনিস্ট আন্দোলনের তরুণ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে তারা একটার পর একটা ষড়যন্ত্র মামলা আনলো — পেশোয়ার (১৯২২), কানপুর (১৯২৪), মীরাট (১৯২৯)। ১৯২০-র দশকে পার্টি তৈরি হবার পরপরই পার্টি নিষিদ্ধ ঘোষিত হলো, দু'দশকেরও বেশি নিষেধাজ্ঞার মধ্যেই পার্টিকে কাজ করতে হয়েছিল। তীব্র দমনপীড়ন সত্ত্বেও পূর্ণ স্বাধীনতা এবং মৌলিক সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্যে জনগণকে সমবেত করার কাজে পার্টি ধারাবাহিকভাবেই এগিয়ে চলেছিল।

১·৬ কমিউনিস্ট পার্টির জঙ্গী ও ধারাবাহিক সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী অবস্থান বিভিন্ন বিপ্লবী ধারার যোদ্ধাদের পার্টিতে যোগদানের ব্যাপারে আকর্ষণ করেছিল। তাঁদের মধ্যে ছিলেন পাঞ্জাবের গদর বীরেরা, ভগৎ সিংয়ের সহকর্মীরা, বাংলার বিপ্লবীরা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির জঙ্গী লড়াকু শ্রমিকরা এবং কেরালা, অন্ধ্রপ্রদেশসহ দেশের বিভিন্ন অংশের প্রগতিবাদী সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মনোভাবাপন্ন কংগ্রেস সদস্যরা। এভাবে গোটা দেশের সেরা যোদ্ধাদের পেয়ে পার্টি সমৃদ্ধ হয়েছিল। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, পরে কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির মতো স্বাধীনতা আন্দোলনের সংগঠনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা রেখেই কমিউনিস্ট পার্টি কাজ করেছে। আবার একই সঙ্গে সর্বহারার স্বাধীন পার্টি হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলা, শক্তিশালী করার জন্য নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে গেছে।

১·৭ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্বে ভারতীয় জনগণের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সামন্ততন্ত্র-

বিরোধী আন্দোলন উত্তাল হয়ে ওঠে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এই জাগরণের সামনের সারিতে দাঁড়িয়ে নেতৃত্ব দিয়েছে কমিউনিস্ট পার্টি। তেভাগা, পুন্নাপ্রা ভায়ালার, উত্তর মালাবার ওয়ারলি আদিবাসী, ত্রিপুরা উপজাতি জনসাধারণের লড়াই এবং সর্বোপরি তেলেঙ্গানার ঐতিহাসিক সশস্ত্র কৃষক সংগ্রাম ছিল দারুণ তাৎপর্যপূর্ণ। অনেকগুলি রাজন্যবর্গ চালিত রাজ্যে দায়িত্বশীল সরকারের জন্য জনগণের আন্দোলনে পার্টি নেতৃস্থানীয় ভূমিকা নিয়েছিল। ফরাসী ও পর্তুগীজ অধিকৃত পণ্ডিচেরী ও গোয়ার মুক্তিসংগ্রামকে সংগঠিত করতে ও সমর্থন যোগাতে পার্টি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিল। ১৯৪৬-র নৌবিদ্রোহের মধ্যে দিয়ে শ্রমিক, কৃষক, ছাত্রদের সংগ্রামের ঢেউ এক নতুন তরঙ্গশীর্ষে পৌঁছায়। ফ্যাসিবাদের পরাজয় ও জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের ক্রমবর্ধমান ঢেউয়ের আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে এই গণসংগ্রামের মুখোমুখি পড়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও প্রধান বুর্জোয়া দল কংগ্রেস এবং মুসলিম লিগের নেতারা সমঝোতায় উপনীত হয়। ফলশ্রুতিতে দেশ ভাগ হয়ে যায় এবং বুর্জোয়া-ভূস্বামী শ্রেণীগুলির নেতৃত্বে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ভারত ও পাকিস্তানের জন্ম হয়। জাতীয় আন্দোলনে বুর্জোয়াদের নেতৃত্ব থাকায় এই সমঝোতার পথ সহজ হয়েছিল। এইভাবে প্রধানত বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধে পরিচালিত সাধারণ জাতীয় ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্টের যে স্তর, তার অবসান হলো।

১·৮ স্বাধীনতার পরেও কমিউনিস্ট পার্টিকে নিপীড়ন সহ্য করতে হয়েছে। ১৯৪৮ এবং ১৯৫২-র মধ্যে কংগ্রেস শাসকদের তীব্র আক্রমণ হয় বিশেষ করে তেলেঙ্গানা এবং পরবর্তীকালেও বারেবারে দমনপীড়ন চালানো হয়েছে, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে ও পরে ত্রিপুরায় আধা-ফ্যাসিস্ত সন্ত্রাসের সময়, কেরালা ও দেশের অন্যান্য জায়গায় পার্টিকর্মীদের ওপর হিংস্র আক্রমণও চলেছে। কিন্তু এই নিপীড়ন বৈপ্লবিক সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ থেকে পার্টিকে বিরত করতে পারেনি। বিভেদকামী, বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন যখন জাতীয় ঐক্যকে বিপন্ন করেছে জনগণের ঐক্য রক্ষার সংগ্রামে পার্টি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। পাঞ্জাব, ত্রিপুরা, আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, কাশ্মীরে বিচ্ছিন্নতাবাদী ও বিভেদকামী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জীবন বিসর্জন দিয়েছেন শত শত সাহসী পার্টিকর্মী।

১·৯ এভাবে জন্মলগ্ন থেকেই ভারতীয় রাজনীতিতে প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করে গেছে কমিউনিস্ট আন্দোলন। গণভিত্তি, জনপ্রিয় আবেদন, বুর্জোয়া-ভূস্বামী শাসনের বিকল্প নীতি নিয়ে কমিউনিস্ট আন্দোলন দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে এক উল্লেখযোগ্য শক্তি। ১৯৫৭ সালের কেরালায় প্রথম কমিউনিস্ট মন্ত্রিসভা এবং পরে পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা ও

ত্রিপুরায় পরপর বামপন্থী নেতৃত্বের সরকার গণমুখী নীতি রূপায়ণের প্রয়াস নিয়ে পথপ্রদর্শকের কাজ করেছে। এইসব সরকারগুলি বর্তমান কাঠামোর মধ্যে ভূমিসংস্কারকে রূপায়িত করেছে, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করেছে, পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে পুনরুজ্জীবিত করেছে, শ্রমজীবী জনসাধারণের জন্য গণতান্ত্রিক অধিকারের ব্যবস্থা করেছে এবং বিকল্প নীতির জন্য সংগ্রামরত দেশের গণতান্ত্রিক শক্তিকে শক্তিশালী করেছে। কঠিন সংগ্রামের পথে পার্টি উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে, নিজের সাফল্য-ব্যর্থতার আত্মসমালোচনামূলক বিশ্লেষণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ পার্টি ভুল থেকে নিরন্তর শিক্ষা গ্রহণের চেষ্টা করে, আমাদের সমাজের সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ প্রয়োগের সক্ষমতাকে উন্নত করার চেষ্টা চালিয়ে যায়।

১.১০ সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ সংগ্রামের পরে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) তৈরি হয়েছিল। ১৯৬৪ সালে পার্টি কর্মসূচী গৃহীত হয় এবং পরবর্তীকালে সেই ধারণার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা রণনীতি ও রণকৌশলকে সংশোধনবাদ ও গোঁড়ামির হাত থেকে লড়াই করে রক্ষা করেছে পার্টি। বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে এবং বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনে গুরুতর বিপর্যয় ঘটে। এর ফলে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এবং আন্দোলনের অভিজ্ঞতার পুনর্মূল্যায়ন প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। স্বাধীনতার পর অর্ধ শতাব্দীতে ভারতে বড় আকারের বেশ কিছু পরিবর্তন এবং ঘটনাবলী ঘটে গেছে। সি পি আই (এম) পার্টি কর্মসূচীকে সময়োপযোগী করতে গিয়ে ১৯৬৪ সালের পরবর্তী ঘটনাবলী ও অভিজ্ঞতার পর্যালোচনা করেছে। ১৯৬৪ সালের পর থেকে এইসব ঘটনাবলী ও অভিজ্ঞতার পর্যালোচনা করেই সি পি আই (এম) পার্টি কর্মসূচীকে সময়োপযোগী করছে।

১.১১ বৈপ্লবিক সংগ্রামের বর্তমান স্তরে বিপ্লবী শক্তিগুলির রণনীতিগত লক্ষ্য ভারতীয় জনগণের সামনে পেশ করছে সি পি আই (এম)। সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের পথে একটি পদক্ষেপ হলো জনগণতন্ত্র। পার্টি জনগণতন্ত্র অর্জনের লক্ষ্যে শাসক শ্রেণীগুলির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে শ্রমিক, কৃষক, সমস্ত অংশের শ্রমজীবী জনগণ এবং প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে পরিচালনা করার একটি কর্মসূচী পেশ করছে।

২

সমসাময়িক বিশ্বে সমাজতন্ত্র

২.১ বিংশ শতাব্দী প্রত্যক্ষ করেছে বিশ্বজুড়ে বিপুল পরিবর্তন। এই শতাব্দী ছিল সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের শতাব্দী। এই শতাব্দী দেখেছে বিরাট বিরাট বৈপ্লবিক ঘটনা, যার সূচনা ১৯১৭ সালের অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে জয় ছিল বিরাট এক ঘটনা। সোভিয়েত ইউনিয়ন সেখানে নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করেছিল। ঐতিহাসিক চীন বিপ্লব, ভিয়েতনাম, কোরিয়া, কিউবায় বিপ্লবী শক্তির সাফল্য এবং পূর্ব ইউরোপে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগঠন ছিল সাম্রাজ্যবাদ বনাম সমাজতন্ত্রের মহাসংঘাতের ফলাফল। এই শতাব্দী জাতীয় মুক্তি আন্দোলনেরও শতাব্দী যার মধ্যে দিয়ে উপনিবেশগুলি রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করেছিল। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের তত্ত্বে যেভাবে উপস্থাপিত হয়েছিল, এইসব বিজয় বিশ্ব ইতিহাসে তেমনই এক নতুন যুগকে চিহ্নিত করেছিল। বিজ্ঞান-প্রযুক্তির বিরাট অগ্রগতি এবং এই শতাব্দীর বৈপ্লবিক ঘটনাবলী মানবসভ্যতার সামনে এমন এক অগ্রগতির বিপুল সম্ভাবনা উন্মুক্ত করে, যার কথা আগে স্বপ্নেও ভাবা যায়নি।

২.২ যে সব দেশ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে, তারা এক নতুন আলোকিত পথের সন্ধান দেয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন তৈরি হওয়ায় মানবসভ্যতার ইতিহাসে এই প্রথম শ্রমজীবী মানুষ শ্রেণী শোষণমুক্ত এক সমাজে বাস করতে শুরু করে। দ্রুত শিল্পায়ন, সামন্ততান্ত্রিক অবশেষের অবসান এবং অর্থনীতি, সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সার্বিক অগ্রগতি জনগণের বিপুল অংশকে দিয়েছিল এক নতুন জীবন, শ্রমজীবী মানুষের হাতে এসেছিল ক্ষমতা। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির যুগান্তকারী সাফল্য ছিল : দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতার অবসান, বেকারীর অবসান, স্বাস্থ্য-শিক্ষা-আবাসনের ক্ষেত্রে সামাজিক নিরাপত্তার বিপুল বিস্তার এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বিপুল অগ্রগতি। ধনতন্ত্র লক্ষ্যণীয়ভাবে বিকাশ লাভ করেনি এবং আপেক্ষিকভাবে অনগ্রসর এমন সমাজে এই উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটেছিল। আর্থ-সামাজিক অনগ্রসরতা অতিক্রম করে এবং সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসন, অন্তর্ঘাত এবং হুমকির মোকাবিলা করে কঠিন পরিস্থিতিতে সমাজতন্ত্র নির্মাণ করতে হয়েছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের সাফল্য ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতেও প্রভাব ফেলেছিল। শাসক শ্রেণীগুলি বাধ্য হয়েছিল জনকল্যাণ রাষ্ট্রের ধারণায় নিজেদের নাগরিকদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা চালু করতে, তার প্রসার ঘটাতে।

২.৩ কিন্তু, সমাজতন্ত্র নির্মাণের অনির্ধারিত পথের যাত্রায় সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি গুরুতর ভুলও করে। এই ভুলের উৎস সমাজতন্ত্র নির্মাণের দীর্ঘস্থায়ী চরিত্র সম্পর্কে সঠিক ধারণার অভাব, পার্টি ও রাষ্ট্রের ভূমিকা সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা, অর্থনীতি ও তা পরিচালনার ক্ষেত্রে সময় মতো যথাযথ পরিবর্তন আনার ব্যর্থতা, পার্টি, রাষ্ট্র ও সমাজে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের প্রসার ঘটানোর ক্ষেত্রে ব্যর্থতা, আমলাতান্ত্রিকতার বৃদ্ধি এবং মতাদর্শগত চেতনার অবক্ষয়। এইসব কারণ সমাজতন্ত্রকে ধ্বংস করার জন্য সাম্রাজ্যবাদের নিরন্তর প্রচেষ্টাকে সাহায্য করেছিল। এইসব বিকৃতি মার্কসবাদ-লেনিনবাদের যথার্থতাকে নস্যাৎ করে না, বরং তা বৈপ্লবিক তত্ত্ব ও প্রয়োগ থেকে বিচ্যুতির প্রতিফলন। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির ভাঙন এবং পূর্ব ইউরোপে বিপর্যয় এক নতুন পরিস্থিতির জন্ম দেয়। বিংশ শতাব্দীর শেষে এসে সমাজতন্ত্রের শক্তিকে আবার পুনরুৎসাহিত সাম্রাজ্যবাদের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি পড়তে হচ্ছে। সি পি আই (এম) দৃঢ় বিশ্বাসী যে, বিপর্যয় সত্ত্বেও কমিউনিস্ট আন্দোলন ও বিপ্লবী শক্তিসমূহ ভুল থেকে শিক্ষা নেবে, পুনরায় সংগঠিত হবে এবং সাম্রাজ্যবাদ ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির আক্রমণ মোকাবিলার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করবে।

২.৪ নানা আঁকাবাঁকা পথ, সাফল্য-ব্যর্থতা সত্ত্বেও বিংশ শতাব্দীর ঘটনাবলী, বিশেষ করে ১৯১৭-র পর থেকে, মানবপ্রগতির বিকাশে সমাজতন্ত্র ও জনগণের সংগ্রামের গভীর প্রভাবকে প্রতিফলিত করছে। বৈপ্লবিক রূপান্তর ইতিহাসের গুণগত উল্লম্ফন ঘটিয়েছে, আধুনিক সভ্যতায় অনপনেয় ছাপ ফেলে গেছে। সামাজিক মুক্তি ও সমাজতান্ত্রিক পরিবর্তনের প্রক্রিয়া হবে দীর্ঘস্থায়ী ও জটিল। ইতিহাস প্রমাণ করেছে ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ এক ধাক্কায় ঘটে না, এটি হবে তীব্র শ্রেণী সংগ্রামের এক দীর্ঘস্থায়ী পর্ব এমনকি রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের পরেও।

২.৫ মানবসমাজের মৌলিক সমস্যার সমাধানে বিশ্ব ধনতন্ত্র অক্ষম। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতিকে ব্যবহার করে উৎপাদিকা শক্তির বিপুল বিকাশ অগ্রসর ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে যে বিকাশ ঘটাচ্ছে তা কর্মসংস্থান বাড়াচ্ছে না, বরং আয় ও ধনসম্পদের বৈষম্য আরও তীব্র করছে। বর্ধিত হারে উদ্বৃত্ত মূল্যের শোষণের মাধ্যমে তা শ্রমিকের শোষণকে আরও তীব্র করেছে। বিজ্ঞান-প্রযুক্তির অগ্রগতি ব্যবহৃত হচ্ছে মুষ্টিমেয় ব্যক্তি ও বহুজাতিক কর্পোরেশনের হাতে ধনসম্পদকে ক্রমাগত কেন্দ্রীভূত করার কাজে। প্রমাণিত হয়েছে সাম্রাজ্যবাদ একটি ধ্বংসাত্মক লুণ্ঠনের ব্যবস্থা। বিংশ শতাব্দীতে মানব সভ্যতাকে দু'দুটি

বর্বর বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে সাম্রাজ্যবাদ, যার পরিণতিতে কয়েক কোটি মানুষের প্রাণহানি ঘটেছে। উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে অস্ত্র নির্মাণের শিল্প, যা অর্থনীতির মোট চাহিদাকে বজায় রাখতে সাহায্য করে। রাষ্ট্রকে ক্রমে গুটিয়ে নেবার নয়া-উদারনৈতিক সুপারিশে শ্রমিকশ্রেণী ও সাধারণ নাগরিকদের সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণমূলক সুযোগ-সুবিধা নির্মমভাবে ছাঁটাই করা হচ্ছে। কর্মহীন অর্থনৈতিক বৃদ্ধি, শ্রমের অস্থায়ীকরণ, আয় ও সম্পদের ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান বৈষম্য এর বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর্থিক ব্যবস্থার অস্থিরতা, উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশে মন্দা বা বৃদ্ধির নিচু হার, ক্রমবর্ধমান অযৌক্তিক হারে সম্পদের ব্যবহারের ক্ষেত্রে অপচয়ের ঘটনা হলো ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত সঙ্কটের লক্ষণ। মুনাফার লক্ষ্যে বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলির লালসাপূর্ণ অভিযান এবং ধনী দেশগুলির অসংযত ভোগের ফলে পরিবেশকে ধ্বংস এবং সাধারণভাবে বিশ্বের এবং বিশেষ করে তৃতীয় দুনিয়ার জৈবিক ভারসাম্যকে গুরুতরভাবে বিপদাপন্ন করছে। উৎপাদনের ক্রমবর্ধমান সামাজিকীকরণ ও উদ্বৃত্তের ক্রমবর্ধমান বেসরকারী কুক্ষিগতকরণের যে মৌলিক দ্বন্দ্ব ধনতন্ত্রের অন্তর্নিহিত তা আরো তীক্ষ্ণ হয়েছে।

২.৬ পুঁজিবাদের বর্তমান পর্বে ফিন্যান্স পুঁজির কেন্দ্রীভবন ও আন্তর্জাতিকীকরণ নজিরবিহীন মাত্রায় পৌঁছেছে। বিশ্বজুড়ে সঞ্চারণশীল ফিন্যান্স পুঁজি রাষ্ট্রগুলির সার্বভৌমত্বকে আঘাত করছে, অতি মুনাফার লক্ষ্যে অর্থনীতিতে অবাধ বিচরণের অধিকার চাইছে। ফাটকামুখী ফিন্যান্স পুঁজির অবাধ চলাচলের স্বার্থে সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা সমস্ত বিধিনিষেধ ভেঙে ফেলছে, পৃথিবীর সমস্ত প্রান্তে এই পুঁজির স্বার্থবাহী শর্ত চাপিয়ে দিচ্ছে। আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার, বিশ্ব ব্যাঙ্ক এবং বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা এই অন্যায় উত্তর-উপনিবেশ বিশ্বব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার হাতিয়ার। ফাটকামুখী ফিন্যান্স পুঁজির নব আধিপত্য উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশে বৃদ্ধিকে মন্থর করে দিয়েছে। তৃতীয় বিশ্ব জড়িয়ে পড়েছে তীব্রতর শোষণ ও ক্রমবর্ধমান ঋণের দুষ্টচক্রে। তুলনায় কম উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশে বাণিজ্যের শর্তাবলী, শিল্প ও কৃষি উৎপাদন, প্রযুক্তি চলাচল, পরিষেবা ক্ষেত্রসহ সবকিছুই সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির স্বার্থ চরিতার্থ করতে বাধ্য হচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা পৃথিবীকে দু'ভাগে ভাগ করে দিয়েছে : একদিকে ধনী উন্নত পুঁজিবাদী দেশ, অন্যদিকে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে বাসরত বিপুলতম সংখ্যার মানুষ। বিংশ শতাব্দীর শেষ দু'দশকে ধনী ও দরিদ্র দেশগুলির মধ্যে ফারাক তীব্রভাবে বাড়তে শুরু করেছিল। সাম্রাজ্যবাদ-পরিচালিত বিশ্বায়নের মধ্যে দিয়ে তা আরও বেড়েছে।

২.৭ পুরনো ধাঁচের উপনিবেশের অবসানের পরে নয়া-ঔপনিবেশিক কায়দা নিয়ে চলছিল সাম্রাজ্যবাদ। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিপর্যয়ের পরে সাম্রাজ্যবাদ বিশ্বজুড়ে আধিপত্যের চেষ্টা আরও বাড়িয়ে তুলেছে। নিজের আধিপত্য কায়েম করতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামরিক ক্ষমতাকে আগ্রাসীভাবে ব্যবহার করছে। ন্যাটোর প্রসার ঘটিয়ে, বিশ্বের নানা জায়গায় সামরিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদ-পরিচালিত বিশ্বায়নকে শক্তিশালী করার চেষ্টা হচ্ছে, সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। শক্তি সম্পর্কের পরিবর্তনের ফলে প্রতিকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও চীন, ভিয়েতনাম, কিউবা, কোরিয়া, লাওস প্রভৃতি সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি সমাজতন্ত্রের পক্ষে দৃঢ়ভাবে দায়বদ্ধ রয়েছে। সাম্রাজ্যবাদ বর্তমান সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে অন্তর্ঘাতের সক্রিয় চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে মতাদর্শগত, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নিরন্তর যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। বিশ্বজুড়ে যোগাযোগ ব্যবস্থার বিপ্লবকে ব্যবহার করে আন্তর্জাতিক প্রচার মাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদ-বিরোধী যাবতীয় চিন্তাধারা এবং সমাজতন্ত্রকে দমন করা, হেয় করার আগ্রাসী চেষ্টা চালাচ্ছে।

২.৮ একথা সত্য যে, বিংশ শতাব্দীর শেষে আন্তর্জাতিক শক্তির পারস্পরিক ভারসাম্য সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে। একথাও সত্য যে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নতুন অগ্রগতিকে কাজে লাগিয়ে ধনতন্ত্র উৎপাদিকা শক্তির উন্নতি ঘটাতে সক্ষম হচ্ছে। এতদসত্ত্বেও পুঁজিবাদ একটি সঙ্কট জর্জরিত ব্যবস্থা ও সেই সঙ্গে অত্যাচার, শোষণ, অন্যায়েরই ব্যবস্থা। সমাজতন্ত্রই পুঁজিবাদের একমাত্র বিকল্প। সে-কারণেই পুঁজিবাদ বনাম সমাজতন্ত্রের দ্বন্দ্বই এ যুগের কেন্দ্রীয় সামাজিক দ্বন্দ্ব হিসাবে রয়ে যাচ্ছে। বিশ্বজোড়া নয়া-উদারনৈতিক অভিযানের কারণে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির সঙ্গে তৃতীয় বিশ্বের দ্বন্দ্ব দ্রুত বাড়ছে ও সামনে উঠে আসছে। যেহেতু ধনতন্ত্রের বিকাশ অসম তাই সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির মধ্যে দ্বন্দ্ব বজায় রয়েছে। ধনতন্ত্রের যেসব সমসাময়িক বৈশিষ্ট্যের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, তার কারণে তীব্র হচ্ছে শ্রম ও পুঁজির দ্বন্দ্ব। সবক'টি দ্বন্দ্বই তীব্রতর হচ্ছে, বিশ্বের ঘটনাবলীতে প্রভাব ফেলছে।

২.৯ সাম্রাজ্যবাদ ও তার শোষণমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রামের জন্য শ্রমিকশ্রেণী ও তার পার্টিগুলিকে মতাদর্শগতভাবে, রাজনৈতিকভাবে এবং সাংগঠনিকভাবে প্রস্তুত হতে হবে। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের স্বার্থে, যে শাসকশ্রেণী বর্তমানের অন্যায় বিশ্বব্যবস্থা টিকিয়ে রাখতে চায় তাদের পরাস্ত

করার স্বার্থে বিশ্বজুড়ে বামপন্থী, গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল শক্তির ঐক্য গড়ে তুলতেই হবে। সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাবাদের নীতির প্রতি অনুগত পার্টি হিসাবে সি পি আই (এম) সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অঙ্গীকারবদ্ধ। সাম্রাজ্যবাদ-নির্দেশিত বিশ্বায়নের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে, শান্তি, গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের সপক্ষে লড়াইরত বিশ্বের সমস্ত শক্তির প্রতি সি পি আই (এম) সংহতি জ্ঞাপন করছে।

৩

স্বাধীনতা ও পরবর্তী সময়

৩.১ ভারতীয় জনগণের ব্যাপক অংশ বিপুল উৎসাহে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছিলেন, এই সংগ্রামকে সফল করে তুলেছিলেন। দেশপ্রেম তাঁদের অনুপ্রাণিত করেছিল, স্বাধীন ভারত ও জনগণের জন্য এক নতুন জীবনের দিকে তাঁরা তাকিয়ে ছিলেন। তাঁরা আশা করেছিলেন দারিদ্র্য ও শোষণের দুর্দশার অবসান ঘটবে। তাঁদের কাছে স্বাধীনতার অর্থ ছিলো জমি, খাদ্য, ন্যায্য মজুরি, শিক্ষা, আবাসন, চিকিৎসার ব্যবস্থা, কর্মসংস্থান। স্বাধীনতার অর্থ ছিলো জাতপাত ও সাম্প্রদায়িক ঘৃণার মতো সামাজিক অভিশাপ থেকে মুক্তি, গণতান্ত্রিক এক কাঠামোয় মানুষের সাংস্কৃতিক আকাঙ্ক্ষাপূরণ।

৩.২ শ্রমিকশ্রেণী, কৃষকসমাজ, মধ্যবিত্ত শ্রেণীগুলি, বুদ্ধিজীবী, মহিলা, ছাত্র, যুবদের গণ অংশগ্রহণের ফলেই স্বাধীনতার লক্ষ্যে জাতীয় আন্দোলন সফল হয়েছিল। কিন্তু নেতৃত্ব থেকে যায় বুর্জোয়াদেরই হাতে। নতুন রাষ্ট্রের নেতৃত্বে থাকা বৃহৎ বুর্জোয়ারা গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মৌল কর্তব্য সম্পন্ন করতে অস্বীকার করে। ভারতীয় সমাজের পুনর্জাগরণের পথ ছিলো উৎপাদিকাশক্তির সমস্ত শৃঙ্খলকে চূর্ণ করা। প্রয়োজন ছিলো পরজীবী জমিদারতন্ত্রের বিলোপ ঘটিয়ে কৃষিমজুর ও গরিব কৃষকদের মধ্যে জমি বণ্টনের। বিদেশী পুঁজির শ্বাসরোধী আধিপত্য থেকে শিল্পকে মুক্ত করতে পারলে আমাদের শিল্পের বিকাশ ঘটতো, স্বনির্ভর অর্থনীতিসম্পন্ন এক অগ্রসর শিল্পোন্নত দেশের ভিত্তি তৈরি হতে পারতো। গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্তব্য পুরোপুরি সম্পাদন করলে তার সম্ভাব্য ফলাফল কী হতে পারে তাতে শঙ্কিত হয়ে বৃহৎ বুর্জোয়ারা ভূস্বামীদের সঙ্গে মিত্রতায় আবদ্ধ হলো এবং সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপস করলো। কংগ্রেস শাসকদের নীতিতে বুর্জোয়া-জমিদার মৈত্রীর প্রতিফলন ঘটেছে। পরবর্তী দশকগুলিতে পুঁজিবাদী পথের চরিত্র নির্ধারিত হয়েছে শাসকশ্রেণীগুলির এই চরিত্র দ্বারাই।

৩·৩ দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্যে ভরপুর ভারত। আমাদের আছে প্রচুর কৃষিযোগ্য জমি, সেচের সম্ভাবনা, বিভিন্ন অঞ্চলে নানা ধরনের শস্য উৎপাদনের সহায়ক আবহাওয়া, বিপুল খনিজ সম্পদ, বিদ্যুৎ উৎপাদনের দারুণ সম্ভাবনা। ভারতের বিরাট মানবশক্তি, আমাদের জনগণের বৈজ্ঞানিক, কারিগরি দক্ষতা, বুদ্ধিবৃত্তি, পরিচালনার যোগ্যতা যা অযুত সম্ভাবনার ভাণ্ডার স্বরূপ। এই সম্ভাবনার বিকাশ ঘটানোর পরিবর্তে রাষ্ট্রক্ষমতা অর্জনের পর বৃহৎ বুর্জোয়ারা এমন এক পুঁজিবাদী বিকাশের রাস্তা নিলো যা তাদের নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থ চরিতার্থ করার উপযোগী।

৩·৪ স্বাধীনতার পর বুর্জোয়াশ্রেণীর দ্বৈত চরিত্র প্রকাশিত হয় সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব ও আঁতাতের মাধ্যমে। বৃহৎ বুর্জোয়ারা রাষ্ট্রের ক্ষমতা অর্জনের পর একটি বিশেষ ধরনের পুঁজিবাদী বিকাশের পথ নেয়। তারা সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপস করে, ভূস্বামীদের সঙ্গে মৈত্রী রক্ষা করে। রাষ্ট্রের ওপর তাদের কর্তৃত্বকে তারা ব্যবহার করেছে একদিকে জনগণের ওপর আক্রমণের জন্য, অন্যদিকে চাপ, দরকষাকষি ও সমঝোতার মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদ ও ভূস্বামীতন্ত্রের সঙ্গে দ্বন্দ্ববিরোধ সমাধানের জন্য। এই প্রক্রিয়ায় তারা বিদেশী একচেটিয়ার সঙ্গে জোরদার সম্পর্ক তৈরি করেছে, ভূস্বামীদের সঙ্গে ক্ষমতা ভাগাভাগি করে নিয়েছে। অবাধনীতির ক্ষেত্রেও বৃহৎ বুর্জোয়ারাই বিদেশী পুঁজির জন্য অর্থনীতি উন্মুক্ত করে দেওয়া এবং আন্তর্জাতিক ফিন্যান্স পুঁজির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরির পক্ষে সবচেয়ে জোরদার সওয়াল করছে। রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র এবং সামগ্রিকভাবে সমগ্র অর্থনীতির বেসরকারীকরণের দাবির প্রধান হোতা এরাই।

৩·৫ স্বাধীনতার পর প্রথম দিকে পশ্চিমী দেশগুলির কাছ থেকে যথাযথ সাড়া না পেয়ে ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী সাহায্যের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের দ্বারস্থ হয়েছিল। তারা ধনতন্ত্র নির্মাণের জন্য যে পথ গ্রহণ করেছিল তা ছিলো রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতাপ্রাপ্ত ধনতন্ত্র। নিজেদের অবস্থানকে জোরদার করতে সাম্রাজ্যবাদ ও সমাজতন্ত্রের দুই শিবিরের অস্তিত্বকে তারা দরকষাকষির সুযোগ হিসেবে কাজে লাগায়। ধনতান্ত্রিক পথের অঙ্গ হিসাবেই অর্থনৈতিক পরিকল্পনার রাস্তা নেওয়া হয়। শোষক শ্রেণীগুলির একটি মুষ্টিমেয় অংশের স্বার্থরক্ষার দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই প্রাথমিকভাবে বাজেট বা সাধারণ অর্থনৈতিক নীতিসমূহ নির্ধারিত হয়েছে। ভারী শিল্প ও পরিকাঠামো ক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র গড়ে তোলা হয় কেননা এত বিরাট মাপের প্রকল্পগুলির জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ বেসরকারী ক্ষেত্রের হাতে ছিলো না। এই রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলি তৈরি হওয়ায় কিছু পরিমাণে

অর্থনীতির শিল্পভিত্তি তৈরিতে সহায়ক হয়েছিল, সাম্রাজ্যবাদী একচেটিয়া পুঁজির ওপর আপাদমস্তক নির্ভরশীলতা অতিক্রম করা গিয়েছিল।

৩·৬ ভারতের মতো অনগ্রসর দেশে বুর্জোয়াশ্রেণীর হাতে থাকা রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সরকারী নীতির সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও প্রাপ্য সম্পদের অধিকতর উপযোগী ব্যবহারের সুযোগ করে দিয়ে নিশ্চিতভাবেই ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক বিকাশকে একটি নির্দিষ্ট গতি ও অভিমুখ দেয়। এই পরিকল্পনাগুলির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য দেখা গেছে শিল্পের প্রসারে, বিশেষ করে রাষ্ট্রায়ত্ত এলাকায় কিছু ভারী ও যন্ত্রনির্মাণ শিল্প স্থাপনের মধ্যে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি, বিশেষত সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে ধারাবাহিক সাহায্য পাওয়া গেছে বলেই এই সাফল্য সম্ভবপর হয়েছে। ব্যাঙ্ক, বীমার মতো আর্থিক ক্ষেত্র এবং তেল ও কয়লা শিল্পের জাতীয়করণের মাধ্যমে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের সম্প্রসারণ ঘটেছিল।

৩·৭ শিল্পায়নের জন্য আরও কিছু নীতিগত পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল যদিও সেগুলি ছিলো অসম্পূর্ণ। গবেষণা এবং উন্নয়নের ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল, একটি নতুন পেটেন্ট আইন গৃহীত হয়েছিল, আমাদের বাজারে বিদেশী পণ্য ও পুঁজির প্রবেশের ওপর নিয়ন্ত্রণ জারি করা হয়েছিল, ক্ষুদ্রশিল্পের জন্য রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ভারতের পরিস্থিতিতে এই সমস্ত ব্যবস্থা কিছুটা হলেও অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতা ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির ওপর চূড়ান্ত নির্ভরশীলতা কাটিয়ে ওঠার সহায়ক হয়েছিল, শিল্পায়নের কারিগরি ভিত্তি স্থাপনে সাহায্য করেছিল।

৩·৮ রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের বিকাশ এবং সীমায়িত পরিকল্পনার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের পাশাপাশি পরপর সরকারগুলির নীতিতে সম্পদের কেন্দ্রীভবন বৃদ্ধি পেয়েছে, দ্রুত বেড়ে উঠেছে একচেটিয়া কারবার। বৃহৎ বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র নিজেই পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠার হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। সরকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির দেওয়া ঋণের বিপুল অংশই করায়ত্ত করেছে বৃহৎ বুর্জোয়ারা। উপর্যুপরি সরকারগুলির বাজেট ও করনীতি পরিকল্পিত হয়েছে জনগণের কাছ থেকে সম্পদ নিয়ে বুর্জোয়া-ভূস্বামীশ্রেণীর সঙ্কীর্ণ অংশের হাতে হস্তান্তর করার লক্ষ্যে। বিপুল পরিমাণ কর ফাঁকি বিশালায়তন কালো টাকার জন্ম দিয়েছে, মূলধনের ব্যক্তিগত সঞ্চয় বৃদ্ধির একটা কায়দা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ধনতান্ত্রিক বিকাশের পরিকল্পনায় অর্থসংস্থানের নামে সাধারণ মানুষ, শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্তকে নির্মমভাবে শোষণ করা হয়েছে।

মৌলিক ভূমিসংস্কারের অভাবে দেশীয় বাজার সীমাবদ্ধ রয়ে গেছে এবং দেশীয় শিল্প বিদেশী পুঁজির ওপর নির্ভর না করে বেড়ে উঠতে বা সম্প্রসারিত হতে পারলো না। বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক ও অভ্যন্তরীণ ঋণের মাধ্যমে এই ধরনের রাষ্ট্রীয় ধনতন্ত্রে অর্থের যোগান দেওয়া হয়েছে। একচেটিয়ার বাড়বাড়ন্ত এবং বিদেশী ফিন্যান্স পুঁজির ক্রমবর্ধমান অনুপ্রবেশ এ-পথের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৩·৯ পঞ্চাশের দশক থেকে শাসকশ্রেণী ধনতান্ত্রিক বিকাশের যে-পথ নিয়েছিল তা সঙ্কট-জর্জরিত হতে বাধ্য ছিলো। শেষপর্যন্ত তা বদ্ধদশায় পৌঁছেও যায়। ভূস্বামীদের সঙ্গে বৃহৎ বুর্জোয়াদের সমঝোতার ফলে কৃষকদের ক্রয়ক্ষমতা যথেষ্ট বাড়লো না, তারফলে অভ্যন্তরীণ বাজার সম্প্রসারিত হলো না। শিল্পায়নে অর্থ যোগান এবং রাষ্ট্রের ব্যয়নির্বাহে বৈদেশিক ও অভ্যন্তরীণ ঋণের ওপর ক্রমবর্ধমান নির্ভরশীলতা বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্য এবং ফিসক্যাল ঘাটতি উভয় ক্ষেত্রেই গুরুতর সঙ্কট ডেকে আনলো। অবশেষে এই আর্থিক সঙ্কটের পরিণতিতে কংগ্রেস সরকার আই এম এফ-বিশ্বব্যাঙ্কের শর্তাবলী মেনে নিলো। ভারতীয় বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণী বিদেশী ফিন্যান্স পুঁজির সঙ্গে ক্রমবর্ধমান সহযোগিতা এবং অর্থনীতি উন্মুক্ত করে দিয়ে এই সঙ্কট মোকাবিলার চেষ্টা করেছে।

৩·১০ বৃহৎ বুর্জোয়াদের মূলধনের ভিত্তি আগে দুর্বল ছিলো। তখন তারা পরিকাঠামো তৈরির জন্য রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের পক্ষে ছিলো। কালক্রমে তারা যথেষ্ট মূলধন সঞ্চয় করেছে এবং রাষ্ট্রীয় সহায়তার বিকাশ ও ভরতুকিতে হৃষ্টপুষ্ট হয়ে উঠেছে। আশির দশকের মাঝামাঝি রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের জন্য সংরক্ষিত মৌল ক্ষেত্রে প্রবেশ করে, রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র দখল করে বিদেশী পুঁজির সঙ্গে সহযোগিতায় নতুন নতুন ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়তে বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণী তৈরি হয়ে গেল। এই ঘটনা এবং রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতাপুষ্ট ধনতান্ত্রিক পথের সঙ্কট উদার নীতির অভ্যন্তরীণ ভিত্তি প্রস্তুত করেছিল। বহিরাগত কারণ হিসাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিপর্যয় নীতি পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকে দ্রুততর করে আই এম এফ-বিশ্বব্যাঙ্কের শর্তাবলী গ্রহণের রাস্তায় ঠেলে দেয়।

৩·১১ অর্থনীতি উন্মুক্ত ও উদার করার চাপের সামনে আশির দশকের মধ্যভাগে রাজীব গান্ধীর শাসনের সময় অর্থনৈতিক নীতিতে পরিবর্তন আসে। আমদানির ক্ষেত্রে উদারীকরণ এবং ক্রমবর্ধমান স্বল্পমেয়াদী ঋণের ফলে ফিসক্যাল ঘাটতি বিপুল চেহারা নেয়। এরই সঙ্গে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির

পরিবর্তন এমন এক অবস্থার জন্ম দেয় যেখানে ১৯৯১ সালে কংগ্রেস সরকার আই এম এফ-বিশ্বব্যাঙ্কের শর্তাবলী মেনে নিয়ে কাঠামোগত পুনর্বিন্যাসের ঋণ নেয় । বি জে পি ক্ষমতায় এসে উদারীকরণের নীতিকে আরও জোরের সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যায়। ১৯৯১ থেকে পরপর সরকারগুলির উদারনীতি ও কাঠামোগত পুনর্বিন্যাসের নীতির ফলে বিদেশী পুঁজির কাছে অর্থনীতি আরও খুলে দেওয়া হয়েছে, রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র ধ্বংসের প্রক্রিয়া চালু হয়েছে, আমদানি আরও অবাধ করা হয়েছে। এযাবৎ রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের জন্য সংরক্ষিত ক্ষেত্র বিদেশী ও ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজির জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের বিলোপসাধনের লক্ষ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার সরকারী শেয়ার বিলগ্নীকরণ করা হচ্ছে, বেসরকারী একচেটিয়া পুঁজিকে তা সস্তায় বিক্রি করা হচ্ছে। আমদানি শুল্ক হ্রাস পাওয়ায় বিদেশী পণ্য এসে হটিয়ে দিচ্ছে দেশীয় পণ্যকে। ফলে একের পর এক কারখানা বন্ধ হচ্ছে, লক্ষ লক্ষ মানুষের কর্মচ্যুতি ঘটছে। আর্থিক ক্ষেত্রকে উন্মুক্ত করার জন্য আন্তর্জাতিক ফিন্যান্স পুঁজি নিরন্তর চাপ সৃষ্টি করে গেছে। ব্যাঙ্কিং শিল্পের বেসরকারীকরণ ও বীমাক্ষেত্রকে উন্মুক্ত করে দেওয়াকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। ১৯৯৫ সালে 'গ্যাট' চুক্তিতে স্বাক্ষর করায় ভারতকে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বিধিব্যবস্থাকে মেনে নিতে হয়। পেটেন্ট আইনের পরিবর্তন এবং পরিষেবা ক্ষেত্রকে উন্মুক্ত করে দেওয়া সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির স্বার্থরক্ষা করে। এই সমস্ত ঘটনাবলী অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্বের অবক্ষয় ঘটিয়েছে।

৩·১২ উদারীকরণ এবং বেসরকারীকরণের পথ বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রভূত উপকারে এসেছে। নতুন বাণিজ্য গোষ্ঠীর প্রবেশ এদের সংখ্যাবৃদ্ধি করেছে। ২২টি একচেটিয়া গোষ্ঠীর সম্পদ ১৯৫৭ সালে ছিলো ৩১২·৬৩ কোটি টাকা। ১৯৯৭ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১,৫৮,০০৪·৭২ কোটি টাকা। অর্থাৎ, পাঁচশো গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। উদার নীতিতে বৃহৎ বাণিজ্যিক গোষ্ঠী এবং ধনী অংশকে বড় বড় সুবিধা দেওয়া হয়েছে আয়করের হার কমিয়ে, সম্পদ করের মতো অন্যান্য কর তুলে দিয়ে। সম্পদশালী শ্রেণীগুলি এরফলে প্রভূত পরিমাণে ধনী হয়ে উঠেছে, তাদের উপভোগের জন্য বিলাসপণ্যের বাজার সম্প্রসারিত হয়েছে। এই চাহিদা মেটাতে বিদেশী পুঁজির সঙ্গে সহযোগিতায় দেশেই তেমন পণ্য উৎপাদিত হচ্ছে অথবা আমদানি করে আনা হচ্ছে। বিদেশী পুঁজি নির্বিচারে ঢুকে পড়ায় দেশীয় শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলি আক্রান্ত হচ্ছে। বহুজাতিক সংস্থা ভারতীয় কোম্পানি কিনে নিচ্ছে। যদিও অ-বৃহৎ বুর্জোয়াদের কিছু অংশ বিদেশী পুঁজির সঙ্গে সহযোগিতায় রাজি বলে

মনে হচ্ছে। মাঝারি ও ছোট পুঁজিপতিদের বিরাট অংশই উদার নীতির আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত।

৩·১৩ উদারীকরণের পর্বে বৈদেশিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় ধরনের ঋণই বৃদ্ধি পেয়েছে। কেবল সুদ মেটাতেই খরচ হচ্ছে রাজস্ব ব্যয়ের এক বড় অংশ। সরকারী বিনিয়োগ ও বরাদ্দ কমে যাচ্ছে, যারফলে উন্নয়নের কাজকর্ম এবং দারিদ্র্য দূরীকরণের প্রকল্পগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। উদার নীতির ফলে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও আঞ্চলিক বৈষম্য তীব্রভাবে বেড়ে গেছে। এমনকি সরকারী পরিসংখ্যানেও দারিদ্র্যসীমার নিচে থাকা মানুষের সংখ্যা বেড়ে গেছে বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায়। অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের, বিশেষ করে খাদ্যসামগ্রীর ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধিতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন দরিদ্র মানুষ। গণবন্টন ব্যবস্থা ছাঁটাই হওয়ায় তাদের দুর্দশা আরও বেড়েছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান ও সমাজকল্যাণ প্রকল্পের মতো সামাজিক ক্ষেত্রের ব্যয়বরাদ্দ ছাঁটাই হওয়ার বিপর্যয়কর প্রভাব পড়েছে শ্রমজীবী মানুষের ওপর।

৩·১৪ পুঁজিপতি ও সরকারের চাপিয়ে দেওয়া বিপুল বোঝার ভার বইতে হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীকে। জিনিসের দাম ক্রমাগত বেড়ে চলায় শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরি বাড়ে না। শিল্পক্ষেত্রে সঙ্কট মহামারীর আকার নেওয়ায় ক্লোজার ও ছাঁটাইয়ের আক্রমণের মুখে পড়েছে শ্রমিকরা। শ্রমিকদের অধিকার রক্ষায় ঘোষিত আইনগুলি ত্রুটিপূর্ণ। এমনকি এগুলিও প্রয়োগ করা হয় না, নিয়োগকর্তাদের তরফে আইনলঙ্ঘনই স্বাভাবিক নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। গোপন ব্যালটে ট্রেড ইউনিয়নের স্বীকৃতি ও যৌথ দর কষাকষির অধিকার থেকে শ্রমিকদের বঞ্চিত করা হচ্ছে। উদারীকরণ ও বেসরকারীকরণের আগ্রাসনে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক কর্মহীন হয়ে পড়েছেন এবং তাদের ভরসা করার মতো কোনো সামাজিক নিরাপত্তাও নেই। উদারীকরণ নীতির অঙ্গ হিসাবে শ্রম বাজারের বিনিয়ন্ত্রণ দাবি করা হচ্ছে। দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে অর্জিত শ্রমিকদের সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার খর্ব করার চেষ্টা চলছে। স্থায়ী চাকরিকে অস্থায়ী বা চুক্তিভিত্তিক কাজে পরিণত করা হচ্ছে। শ্রমজীবী মহিলারা কম মজুরি পেয়ে থাকেন আর ছাঁটাইয়ের কোপও পড়ে সর্বাগ্রে তাঁদেরই ওপর। শিশুশ্রম বৃদ্ধি পেয়েছে, এবং শ্রমজীবী শিশুরা নিকৃষ্টতম শোষণের শিকার। সংগঠিত ক্ষেত্রের বাইরে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক শ্রম আইনের সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত, এমনকি সরকারের নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরিও তাঁরা পান না। বিরাট অসংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমদানরত পুরুষ ও মহিলাদের অবস্থা শোচনীয়। মজুরি হিসাবে তাঁরা পান নামমাত্র, তাদের শ্রমসময় দীর্ঘ, প্রায়ই কাজের পরিবেশ হয় বিপজ্জনক, কোনো সামাজিক

নিরাপত্তাও নেই। বিরতিহীন শ্রম এবং শ্রমিকশ্রেণীকে শোষণের মধ্যে দিয়েই বুর্জোয়া শ্রেণী, বড় ঠিকাদার ও বহুজাতিক কর্পোরেশন মুনাফা ভোগ করছে।

৩·১৫ কৃষি সমস্যা ভারতের জনগণের সামনে সর্বপ্রধান জাতীয় সমস্যা হিসাবে রয়ে গেছে। এর সমাধান সম্ভব বৈপ্লবিক পরিবর্তনের মাধ্যমে, যারমধ্যে পড়বে আমূল ও সর্বব্যাপ্ত কৃষিসংস্কার যা জমিদারতন্ত্রকে মহাজন-ব্যবসায়ীর শোষণকে, গ্রামাঞ্চলে জাতপাত ও লিঙ্গভিত্তিক অত্যাচারকে উৎখাত করার লক্ষ্যে কাজ করবে। কৃষি সমস্যাকে সমাধান করা দূরে থাক, অন্তত প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিবেচনার ক্ষেত্রে ভারতে বুর্জোয়া-ভূস্বামী শাসনের ব্যর্থতা এই শাসনের দেউলিয়াপনাকে সবচেয়ে প্রকটভাবে প্রমাণ করেছে।

৩·১৬ স্বাধীনতার পরে জমিদারতন্ত্রের বিলোপের বদলে কংগ্রেস শাসকরা তেমনই কৃষিনীতি গ্রহণ করেছে যা আধা সামন্ততান্ত্রিক জমিদারকে ধনতান্ত্রিক জমিদারে রূপান্তরিত করে, ধনী কৃষকদের একটি স্তর গড়ে ওঠে। পুরনো বিধিবদ্ধ জমিদারতন্ত্র বিলোপের আইনী ব্যবস্থায় তারা বিপুল পরিমাণ ক্ষতিপূরণ পায়, বিরাট পরিমাণ জমিও দখলে রেখে দেয়। প্রজাস্বত্ব আইনে নিজে চাষ করার অজুহাতে জমি পুনর্গ্রহণের ব্যবস্থা থাকায় লক্ষ লক্ষ স্বত্বাধিকারী কৃষক জমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে যান। জমির ঊর্ধ্বসীমা আইনে যথেষ্ট ফাঁকফোঁকর রেখে দেওয়া হয় যার সাহায্যে বড় জোত অটুট রাখা সম্ভব হয়। লক্ষ লক্ষ একর উদ্বৃত্ত জমি অধিগ্রহণ করা হয়নি, কৃষিমজুর ও গরিব কৃষকের মধ্যে বন্টনও হয়নি। গ্রামীণ ক্ষেত্রে রূপান্তরের যে ঐতিহাসিক সম্ভাবনা ছিলো—সে ব্যাপারে পর্বতপ্রমাণ বিশ্বাসঘাতকতার নজির রেখেছে কংগ্রেস দল। চালু আইনের মধ্যে ভূমিসংস্কার রূপায়ণ করেছে কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা, ত্রিপুরায় সি পি আই (এম)-নেতৃত্বাধীন বামপন্থী সরকারগুলি।

৩·১৭ কংগ্রেস সরকার এবং তার পরবর্তী সরকারগুলির কৃষিনীতির লক্ষ্য ছিলো বিনিয়োগের বরাদ্দ ও সরকারী ঋণের সুযোগ জমিদার ও ধনী কৃষকদের পাইয়ে দেওয়া। এইসব অংশ ব্যাঙ্ক ও সমবায়ের ঋণ করায়ত্ত করেছে। ষাটের দশকের শেষদিক থেকে প্রযুক্তির ব্যবহার, গম ও চালের নতুন নতুন ধরনের ক্ষেত্রে উচ্চ ফলনশীল বীজের ব্যবহার, রাসায়নিক উপাদানের ফলে খাদ্যশস্য ও অন্যান্য খাদ্য-বহির্ভূত শস্যের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়। কৃষির এই বৃদ্ধির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ে বৈষম্য। যদিও ভারতে খাদ্যশস্য উৎপাদন বাড়ে এবং দেশ খাদ্যে স্বনির্ভরতা অর্জনে সক্ষম হয়ে ওঠে, তা সত্ত্বেও লক্ষ কোটি মানুষ যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে ক্ষুধা ও অপুষ্টির শিকার হয়ে রয়ে যান।

৩·১৮ কৃষি সম্পর্কের ক্ষেত্রের প্রধান প্রবণতা হলো গ্রামাঞ্চলে ধনতান্ত্রিক সম্পর্কের বিকাশ। তার বৈশিষ্ট্যগুলি হলো : গ্রামীণ শ্রমজীবী জনতার বিপুল অংশ সর্বহারায় পরিণত হয়েছে, গ্রামীণ জনসংখ্যার অনুপাতে খেতমজুরদের সংখ্যার বিপুল বৃদ্ধি ঘটেছে, কৃষকসমাজের মধ্যে বিভাজনের গতি ত্বরান্বিত হয়েছে, বাজারের জন্য উৎপাদন হচ্ছে, বরাবর স্বত্ব থাকা সত্ত্বেও বিপুল পরিমাণ ভাগচাষী উচ্ছেদ হচ্ছেন, গ্রামীণ ধনীরা বিশেষ করে জমিদাররা কৃষি ও কৃষি-সম্পর্কিত কাজকর্মে বর্ধিত হারে পুঁজি পুনর্বিনিয়োগ করছে যারফলে পূর্বের থেকে অনেক বেশি মাত্রায় পুঁজির পুনরুৎপাদনের ভিত্তি তৈরি হচ্ছে।

৩·১৯ কৃষিতে ধনতান্ত্রিক সম্পর্কের বিকাশ যদিও স্পষ্টই প্রধান সর্বভারতীয় প্রবণতা, বহুতর আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যে কৃষি সম্পর্ক চিহ্নিত। উৎপাদন ও বিনিময়ের ধনতান্ত্রিক সম্পর্কের বিকাশও অসম। দেশের কিছু অঞ্চল আছে যেখানে কৃষিতে ধনতন্ত্র অনেক এগিয়ে গেছে এবং বাণিজ্যিক কৃষি ও নগদ লেনদেন গ্রামীণ অর্থনীতিকে আধিপত্য করে। আবার এমন অঞ্চল আছে যেখানে পুরনো ধাঁচের জমিদারতন্ত্র এবং প্রজাস্বত্ব, পুরনো ধরনের শ্রমপ্রথা, দাসত্ব, বন্ধন আজও কৃষি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। গোটা দেশেই জাতপাতের বিভাজন, জাতপাতের নামে নিপীড়ন, মহিলাদের বিরুদ্ধে নিকৃষ্টতম অত্যাচার, মহাজন ও তেজারতী পুঁজির হাতে গরিবদের শোষণ অবাধে চলছে। ভারতীয় কৃষিতে ধনতান্ত্রিক বিকাশ পুরনো কাঠামোকে দৃঢ়তার সঙ্গে ভেঙে দিয়ে হয়নি, প্রাক্-ধনতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্ক ও সামাজিক সংগঠনের এক বদ্ধজলার ওপরেই তাকে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। 'আধুনিক' ব্যবস্থার বিকাশ হয়েছে সেকেলে ব্যবস্থাকে অব্যাহত রেখেই। ধনতন্ত্র যে কৃষি ও গ্রামীণ সমাজে বহুমুখী ধারায় অনুপ্রবেশ করে ভারত তার এক বিরাট ও জীবন্ত উদাহরণ।

৩·২০ বুর্জোয়া-ভূস্বামী কৃষিনীতির কারণে স্বাধীনতার পাঁচ দশক পরে কৃষকসমাজের ৭০ শতাংশই গরিব কৃষক ও খেতমজুর। যাদের উৎপাদিকা সম্পদের অভাব, নিম্নআয়, দুর্দশাগ্রস্ত জীবন গণ-দারিদ্র্যের বৈশিষ্ট্য। ভারতে গ্রামীণ দারিদ্র্যের হিমালয়প্রমাণ মাত্রা গোটা পৃথিবীতে তুলনাহীন। এমনকি সরকারী তথ্যেও বলা হচ্ছে, স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর বাদে ভারতে সাড়ে ২৮ কোটি গ্রামের মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করেন। দারিদ্র্যের বহুমাত্রা আছে, তা কেবল আয়ের অভাব নয়। হাজারোভাবে এই দারিদ্র্য প্রকট হয়ে ওঠে। গ্রামীণ গরিবদের জমি বা উৎপাদনের অন্য উপকরণের ওপর হয় কোনো অধিকার নেই অথবা থাকলেও নামমাত্র। জমির কেন্দ্রীভবন ও মালিকানার

বৈষম্য কোনো বড় পরিবর্তন ছাড়াই অব্যাহত আছে। এরইসঙ্গে একইরকমভাবে সেচের জলের উৎসের কেন্দ্রীভবন রয়ে গেছে মূলত গ্রামের ধনীদের হাতে। কৃষক ও খেতমজুররা ন্যায্য হারে ঋণের কোনো সুযোগ পান না, মহাজনী সুদের হারে তারা ঋণের গভীর ফাঁদে পড়ে আছেন। কম মজুরি ও মহিলাদের ক্ষেত্রে মজুরি বৈষম্য একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। গড়ে একজন কৃষি মজুর বছরে ১৮০ দিনেরও কম কাজ পান। গ্রামীণ জনসংখ্যার ৫০ শতাংশ অপুষ্টিতে ভুগছেন, গ্রামীণ সাক্ষরতার হার শোচনীয়ভাবে কম, গ্রামের গরিব মানুষ বাস করেন পানীয় জলের সুযোগহীন, চিকিৎসার সুযোগহীন অস্বাস্থ্যকর বাসস্থানে।

৩·২১ বেশিরভাগ গ্রামীণ এলাকায় জমিদার — ধনী কৃষক ঠিকাদার — বড় ব্যবসায়ীদের এক শক্তিশালী আঁতাত গড়ে উঠেছে। এরাই গ্রামের ধনী অংশ। বামপন্থী প্রভাবিত রাজ্যগুলি ছাড়া অন্যত্র এরাই পঞ্চায়েতরাজ প্রতিষ্ঠান, সমবায় সমিতি, গ্রামীণ ব্যাঙ্ক ও ঋণদান সংস্থায় কর্তৃত্ব করে। বুর্জোয়া-জমিদার দলগুলির গ্রামীণ নেতৃত্বকে এরাই নিয়ন্ত্রণ করে। এই অংশ যে উদ্বৃত্ত শুষে নেয় তা টাকা ধার দেওয়া, ফাটকা কারবার, জমি-বাড়ির দালালিতে বিনিয়োগ হয়। কৃষিভিত্তিক শিল্প তৈরিতেও সে টাকা খাটে। গ্রামীণ এলাকায় আধিপত্যকারী শ্রেণী সমর্থন যোগাড়ে জাত পরিচয়কে কাজে লাগায়, হিংসার আশ্রয় নেয় গ্রামের গরিবদের দাবিয়ে রাখতে দুষ্কৃতীদের দিয়ে সন্ত্রাস চালায়। সংবিধান প্রণয়নের ৫০ বছর বাদেও জমিদার-জোতদারদের বিরোধিতার কারণে কোনো সরকার কৃষি মজুরদের ন্যূনতম মজুরির নিশ্চয়তা, জীবনযাপনের মানোন্নয়ন ও সামাজিক নিরাপত্তার কেন্দ্রীয় আইন চালু করেনি।

৩·২২ গ্রামীণ অর্থনীতির দ্রুত বাণিজ্যিকীকরণের ফলে খাদ্যশস্য এবং কৃষিপণ্যের বাজার বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃষি উৎপন্নের ওপর একচেটিয়া কারবারীদের মুষ্টি আরও দৃঢ় হয়েছে। উদারীকরণের ফলে বিশ্ববাজারে উন্নত প্রযুক্তি নিয়ে কর্মরত বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলি কৃষি পণ্যের দামের ওপর আরও বেশি ও আরও প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ কায়েম করেছে। অসম বিনিময় এবং দামের মারাত্মক ওঠানামার মাধ্যমে কৃষকদের শোষণের তীব্রতা বৃদ্ধি স্থায়ী চেহারা নিয়েছে। ফলে, কৃষি উৎপন্নের বিক্রেতা এবং কৃষির জন্য প্রয়োজনীয় শিল্পপণ্যের ক্রেতা হিসাবে উভয় দিক থেকেই কৃষককে ঠকানো হচ্ছে।

৩·২৩ রাষ্ট্রীয় সহায়তাপ্রাপ্ত ধনতান্ত্রিক বিকাশের দম ফুরিয়ে যাবার পরে উদারনীতি চালু হয়। তার ফলে বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে কৃষি ও

গ্রামোন্নয়ন নীতি বিপজ্জনক ও প্রতিক্রিয়াশীল দিকে মোড় নেয়। এই নীতির ফলে কৃষি, সেচ, অন্যান্য পরিকাঠামোগত ক্ষেত্রে সরকারী বিনিয়োগ হ্রাস পেয়েছে, প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্র থেকে ঋণও দারুণভাবে কমে গেছে। এর ফলে গ্রামের গরিব পরিবারগুলি সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। গ্রামীণ কর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য দূরীকরণের প্রকল্প ছাঁটাই করা হয়েছে। রপ্তানিমুখী কৃষির প্রতিই জোর পড়েছে নীতিতে। এর ফলে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির চাহিদা মেটানোর জন্য ভূমিব্যবহার ও চাষের ধরনের পরিবর্তন হচ্ছে। খাদ্যশস্য উৎপাদনে জোর কমিয়ে দেওয়া এবং খাদ্য উৎপাদনে ভারতের স্বনির্ভরতা খর্ব করা সার্বভৌমত্বের পক্ষে প্রত্যক্ষ বিপদ। ডব্লিউ টি ও-র রাজত্বে কৃষি পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে সমস্তরকম পরিমাণগত নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়েছে, যার ফলে কৃষকদের জীবন জীবিকা গুরুতররকম ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বিভিন্ন রাজ্যের জমির উর্ধ্বসীমা আইন লঘু করার জন্য চাপ আসছে। বিদেশী কৃষি বাণিজ্যের জন্য ভারতের বৃহৎ বাণিজ্যের হাতে জমি লিজ দেওয়ার জন্যও চাপ দেওয়া হচ্ছে। বহুজাতিক সংস্থাগুলি বীজ, দুধ ও দুগ্ধজাত সামগ্রী প্রভৃতি কৃষিভিত্তিক উৎপাদনে ও অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রবেশ করছে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা এবং বহুজাতিক কর্পোরেশনের চাপে এমন নীতি নেওয়া হচ্ছে যা জৈব সম্পদের ক্ষেত্রে ভারতের স্বাধীনতা বিসর্জন দিচ্ছে, কৃষক ও প্রকৃত উদ্ভিদ প্রজননকারীর অধিকার কেড়ে নিচ্ছে। কৃষি গবেষণা ও সম্প্রসারণের রাষ্ট্রীয় সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যবস্থা দুর্বল করা হচ্ছে।

৩.২৪ রাষ্ট্রের মদতে কৃষিতে ধনতন্ত্রের বিকাশ বিভাজন তীব্র করেছে। একদিকে জমিদার, ধনতান্ত্রিক কৃষক, ধনী কৃষক ও তাদের সহযোগীদের নিয়ে গ্রামের ধনীরা, অন্যদিকে মূলত খেতমজুর, গরিব কৃষক, গ্রামীণ কারিগরদের নিয়ে বিপুল কৃষক সমাজ। কৃষিতে পরবর্তী সময়ের উদারনীতি গ্রামের গরিবদের ওপর বোঝার পরিমাণ আরও বাড়িয়েছে। এই শোষণ ব্যবস্থাই গণ-দারিদ্র্যের জন্য দায়ী। ভূমির একচেটিয়া আধিপত্য না ভেঙে, গরিব কৃষক ও খেতমজুরদের ঋণের বোঝার অবসান না ঘটিয়ে দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক রূপান্তরের ভিত্তি স্থাপন করা যাবে না।

৩.২৫ সাম্রাজ্যবাদ-পরিচালিত বিশ্বায়ন ও ভারতের শাসক শ্রেণীগুলির অনুসৃত উদারীকরণের নীতি আমাদের দেশের সমস্ত ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী অনুপ্রবেশকে বাড়িয়ে দিয়েছে। বহুজাতিক কর্পোরেশন ও সাম্রাজ্যবাদী ফিন্যান্স পুঁজির জন্য অর্থনীতি উন্মুক্ত করে দেওয়া ভারতীয় সমাজের সর্বত্র এই অনুপ্রবেশ ও প্রভাবের ভিত্তি হিসাবে কাজ করছে। আমলাতন্ত্র, শিক্ষাব্যবস্থা, গণমাধ্যম, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী অনুপ্রবেশ ঘটছে।

৩.২৬ সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ের ফলে বিশ্বে শক্তি ভারসাম্যের পরিবর্তনে মৌলবাদী, প্রতিক্রিয়াশীল, জাতিগোষ্ঠীভিত্তিক উগ্র জাতীয়তাবাদের বৃদ্ধির প্রভাব পড়েছে ভারতেও। এইসব শক্তির বৃদ্ধির সুযোগ নিয়ে সাম্রাজ্যবাদ দেশের ঐক্য দুর্বল করতে চায় যাতে তাদের প্রভাব ও কর্তৃত্ব আরও জোরদার হয়। বহুজাতিক কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রণে শক্তিশালী আন্তর্জাতিক প্রচারমাধ্যম গড়ে উঠেছে। এর মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদ প্রত্যক্ষভাবে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে হস্তক্ষেপ ও প্রভাবিত করার সুযোগ পাচ্ছে। বহুজাতিক প্রচারমাধ্যমের মধ্যে দিয়ে ভোগবাদী, আত্মকেন্দ্রিক, অবক্ষয়ী মূল্যবোধ ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। আমাদের সমাজে তার সরাসরি প্রভাব পড়ছে। বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণী ও অন্যান্য বাণিজ্যিক স্বার্থের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ভারতের প্রচারমাধ্যমও পরিকল্পিতভাবে একই মূল্যবোধ ছড়িয়ে দিচ্ছে। স্বাস্থ্যকর, গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ মূল্যবোধের বিকাশ ঘটাতে গেলে এইসব ক্ষয়িষ্ণু প্রবণতার মোকাবিলা করা প্রয়োজন।

৩.২৭ ১৯৫০ সালে গৃহীত ভারতীয় সাধারণতন্ত্রের সংবিধান রাষ্ট্রের জন্য একগুচ্ছ নির্দেশাত্মক নীতি প্রণয়ন করেছিল। এর মধ্যে রয়েছে প্রত্যেক নাগরিকের জীবনধারণের যথাযথ উপাদান ও কাজের অধিকার, এমন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যা সম্পদকে মুষ্টিমেয়ের হাতে কেন্দ্রীভূত করবে না, শিক্ষার অধিকার ও শিশুদের অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার সুযোগ, শ্রমিকদের জন্য জীবনধারণের উপযোগী মজুরি এবং পুরুষ ও মহিলাদের সম কাজে সম মজুরি। বাস্তবে একটি নীতিও প্রয়োগ হয়নি। সাংবিধানিক ধ্যানধারণা ও বুর্জোয়া শাসকদের প্রয়োগের মধ্যে প্রকট ফারাক স্বাধীনতার পর প্রতিষ্ঠিত বুর্জোয়া-জমিদার ব্যবস্থাকে চূড়ান্তভাবে অভিযুক্তের কাঠগড়ায় দাঁড় করাচ্ছে।

৪

বৈদেশিক নীতি

৪.১ যে কোনো রাষ্ট্র ও সরকারের বৈদেশিক নীতি চূড়ান্ত বিশ্লেষণে তার অভ্যন্তরীণ নীতির প্রতিফলন ব্যতীত কিছুই নয়। প্রধানত তার মধ্যে দিয়ে প্রতিফলিত হয় সেই সরকার ও রাষ্ট্রের নেতৃত্বে থাকা শ্রেণী বা শ্রেণীগুলির স্বার্থ। ভারতের সরকারের বৈদেশিক নীতি স্বাভাবিকভাবেই আমাদের বুর্জোয়া শ্রেণীর সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে বিরোধিতা ও সমঝোতা তথা সহযোগিতার দ্বৈত চরিত্রকে প্রতিফলিত করে। গত পাঁচ দশকে বৈদেশিক নীতির বিবর্তনের দিকে

তাকালেই এই দ্বৈত চরিত্র ধরা পড়ে। মধ্য-পঞ্চাশ পর্যন্ত প্রাথমিক পর্বে ভারত সরকার ব্রিটেন ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে তোষণ করে চলার ভীরু নীতি অনুসরণ করে চলেছিল। কিন্তু মধ্য পঞ্চাশ থেকে এক নতুন অভিমুখ তৈরি হয়। সাম্রাজ্যবাদী ও সমাজতান্ত্রিক শিবিরে তীক্ষ্ণভাবে বিভাজিত বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদী জোটে যোগ না দিয়ে দূরে থাকার সম্ভাবনা তৈরি হয়। বৈদেশিক নীতির পরিবর্তন হয় জোট নিরপেক্ষতার পক্ষে, সামরিক জোটগুলির বিরুদ্ধে, শান্তির পক্ষে, উপনিবেশের জনগণের জাতীয় মুক্তির সংগ্রামের সমর্থনে।

৪·২ এই নীতির ফলে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। যদিও ১৯৬২ সালে চীনের সঙ্গে সীমান্ত সংঘর্ষের সময় ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমী শক্তিগুলির সামরিক সহায়তা চাওয়ায় তাদের সঙ্গে সহযোগিতার একটি পর্ব চলে। এই পর্বের শেষে আবার বৈদেশিক নীতি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী অভিমুখই গ্রহণ করে। ১৯৭১-এ বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধে সমর্থন এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে মৈত্রী চুক্তি এক নতুন পর্বকে চিহ্নিত করে। জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের সমর্থনে এবং বিশ্ব শান্তির প্রশ্নে সত্তরের দশকে ভারত আন্তর্জাতিক মঞ্চে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিল।

৪·৩ বহির্নীতির ক্ষেত্রে ভারতের বুর্জোয়া শ্রেণীর সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের দ্বন্দ্ব প্রকাশিত হয় কাশ্মীর প্রশ্নে এবং পাকিস্তানকে ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করার মার্কিনী সামরিক নকশার প্রশ্নে। সদ্যস্বাধীন দেশগুলির মধ্যে অন্যতম হিসাবে ভারতের বুর্জোয়াশ্রেণী জোট নিরপেক্ষতার নীতিতে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল। মোটের ওপর তা দেশের স্বার্থও ভালোভাবেই রক্ষা করেছে। যদিও শাসক শ্রেণীগুলির শ্রেণী চরিত্রের কারণেই এই নীতির মধ্যে দোদুল্যমানতা ছিলো। বিদেশী পুঁজির সপক্ষে যায় এমন অভ্যন্তরীণ নীতি ও স্বাধীন বৈদেশিক নীতির মধ্যে দ্বন্দ্ব বরাবরই বহাল ছিলো।

৪·৪ সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙন ও অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে উদারীকরণের অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণ করার পরে বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে বৈদেশিক নীতি এক নতুন পর্বে প্রবেশ করে। নরসিমা রাও সরকারের আমলেই দীর্ঘদিনের জোট নিরপেক্ষ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার বৈদেশিক নীতির চাকা উলটো দিকে ঘোরানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়। স্বনির্ভরতার পথ থেকে সরে আসা এবং বিদেশী পুঁজি ও উদারীকরণের ওপর নির্ভর করার ফলে সাম্রাজ্যবাদ ভারতের ওপর আরও চাপ সৃষ্টির সুযোগ পায়। বৈদেশিকনীতির বিভিন্ন অবস্থানে তা

প্রতিফলিত হয়। নব্বইয়ের দশকে ভারত সরকার সামরিক প্রশিক্ষণ ও যৌথ মহড়ার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একটি সামরিক সহযোগিতার চুক্তি স্বাক্ষর করে। ১৯৯৮ সালে বি জে পি নেতৃত্বাধীন সরকার ক্ষমতায় আসায় এই সাম্রাজ্যবাদমুখী প্রবণতা আরো শক্তিশালী হলো। বি জে পি সরকার নীতিগত অবস্থানের বড় পরিবর্তন করেছে, তারা বলেছে যে, দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ছোট সহযোগী হয়ে থাকবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দুনিয়াজোড়া পরিকল্পনাকে সাহায্য করতে তারা দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা জোট নিরপেক্ষ অবস্থানগুলিকে পরিত্যাগ করেছে। বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে ঘনিয়ে আসা বিপদ বাস্তব বিপদ, কেননা ভারতকে চীন ও রাশিয়ার বিরুদ্ধে একটি সামরিক জোটে টেনে এনে দুনিয়াজোড়া পরিকল্পনার লক্ষ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা রয়েছে। জোট-নিরপেক্ষতা ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার ভিত্তিতে ভারতীয় জনগণের প্রকৃত স্বার্থরক্ষাকারী একটি ধারাবাহিক বৈদেশিক নীতি নিশ্চিত নয় যতক্ষণ রাষ্ট্রের নেতৃত্বে বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণী থাকবে এবং তারা সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থবাহী অর্থনৈতিক নীতি রূপায়ণ করে যাবে।

৪·৫ ১৯৯৮-র মে মাসে পোখরানে পরমাণু পরীক্ষার পর বি জে পি-র নেতৃত্বাধীন সরকারের পারমাণবিক অস্ত্র নির্মাণের সিদ্ধান্ত ভারতের বৈদেশিক ও পরমাণু নীতির ক্ষেত্রে এক বিপজ্জনক নতুন পর্বের সূচনা করেছে। পাকিস্তানও ভারতের পরমাণু পরীক্ষার প্রত্যুত্তর দেওয়ায় উপমহাদেশে পরমাণু অস্ত্র প্রতিযোগিতার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এই মারমুখী পরমাণু নীতি জোট-নিরপেক্ষতা ও শান্তির দীর্ঘদিনের নীতিকে খর্ব করেছে এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বাধীন সাম্রাজ্যবাদী চাপের সামনে ভারত আরও নড়বড়ে হয়ে গেছে।

৪·৬ বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক শক্তির সামনে বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদপন্থী ঝোঁকের বিরুদ্ধে লড়াই করা এবং সাম্রাজ্যবাদী চাপ প্রতিহত করতে বৈদেশিক নীতির জোটনিরপেক্ষ ভিত্তি ও অভিমুখ বজায় রাখা নিশ্চিত করার বিরাট সংগ্রাম হাজির হয়েছে। কেননা কেবলমাত্র এ রকম একটি নীতিই বিশ্বের ঘটনাবলীতে ভারতের স্বাধীন ভূমিকা বজায় রাখতে পারে, অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকে রক্ষা করতে পারে।

৫

রাষ্ট্র কাঠামো ও গণতন্ত্র

৫·১ বর্তমান ভারত রাষ্ট্র বৃহৎ বুর্জোয়া শ্রেণীর নেতৃত্বে বুর্জোয়া ও জমিদারদের শ্রেণীশাসনের যন্ত্র, ধনতান্ত্রিক পথে বিকাশের লক্ষ্যে যারা ক্রমেই বেশি বেশি করে আন্তর্জাতিক ফিন্যান্স পুঁজির সঙ্গে সহযোগিতায় লিপ্ত হচ্ছে। দেশের জীবনে রাষ্ট্রের ভূমিকা ও কার্যাবলী এই শ্রেণীচরিত্রের দ্বারাই মূলত নির্ধারিত হয়।

৫·২ যদিও নামে এই রাষ্ট্রকাঠামো যুক্তরাষ্ট্রীয়, অধিকাংশ ক্ষমতা ও সম্পদই কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে কেন্দ্রীভূত। বৃহৎ বুর্জোয়ারা ভাষার অভিন্নতার ভিত্তিতে রাজ্য গঠনের দাবিকে শুরুতে বাধা দিলেও গণসংগ্রামের ও আন্দোলনের তীব্র চাপে এরা বাধ্য হয়ে ভাষাগত রাজ্য গঠনে রাজি হয়। বি জে পি নেতৃত্বাধীন সরকার ভাষাভিত্তিক রাজ্যের আদর্শকে নতুন করে আক্রমণ করছে, তারা প্রশাসনিক সুবিধার জন্য ছোট রাজ্যের পক্ষে ওকালতি করছে। এতে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো আরো দুর্বল হবে। অন্তর্নিহিত ভাবেই গণতন্ত্র-বিরোধী সংবিধানের ৩৫৬ নং ধারাটিকে কেন্দ্র বারেবারে ব্যবহার করে নির্বাচিত রাজ্য সরকারকে বরখাস্ত করেছে, নির্বাচিত রাজ্য বিধানসভা ভেঙে দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অন্তর্ঘাত ও রাজ্যগুলির স্বাধিকারের ওপরে আক্রমণে এটি একটি প্রধান হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। অঙ্গ রাজ্যগুলি খুবই কম ক্ষমতা ভোগ করে, যা তাদের কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর নির্ভরশীল করে রেখেছে। এতে তাদের অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে।

৫·৩ স্বাভাবিক ভাবেই, এইরকম পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যগুলির মধ্যে দ্বন্দ্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। এইসব দ্বন্দ্বের পিছনে প্রায়ই যা থাকে তা হলো বৃহৎ বুর্জোয়াদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রাজ্যটির বুর্জোয়া শ্রেণী ও জমিদারসহ সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের গভীরতর দ্বন্দ্ব। ধনতন্ত্রের অধীনে অসম অর্থনৈতিক বিকাশ তীব্র হওয়ার কারণে এই দ্বন্দ্ব ক্রমাগতই তীব্র হয়ে ওঠে। এর একটি রাজনৈতিক বহিঃপ্রকাশ হলো আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলগুলির উদ্ভব যার মধ্যে দিয়ে এইসব রাজ্যের জনগণের ভাষাগত জাতিসত্ত্বাগত ভাবাবেগের প্রতিফলন ঘটে। সাধারণভাবে এই দলগুলি ঐ অঞ্চলের বুর্জোয়া-জমিদার শ্রেণীগুলির প্রতিনিধিত্ব করে।

৫·৪ স্বাধীনতার পরে অনুসৃত বুর্জোয়া-জমিদার নীতির কারণে জাতীয় ঐক্যের সমস্যা তীব্রতর হয়েছে। দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বিরাট সংখ্যক

সংখ্যালঘু জাতি ও জনগোষ্ঠীর বাস। ধনতান্ত্রিক বিকাশের অসম উন্নয়নে ও আঞ্চলিক ভারসাম্যহীনতার ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এই অঞ্চল। এর ফলে বিচ্ছিন্নতার প্রবক্তা উগ্রপন্থী শক্তিগুলির বিকাশের উর্বর জমি তৈরি হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী এজেন্সিগুলি এই শক্তিগুলিকে ব্যবহার করে। উগ্রপন্থীদের হিংসাত্মক কার্যকলাপ এবং জনগোষ্ঠীগত সংঘাত উন্নয়নমূলক কাজ ও গণতান্ত্রিক কাজকর্মকে ব্যাহত করে।

৫·৫ সংবিধানের ৩৭০ নং ধারা বলে জম্মু-কাশ্মীরকে বিশেষ মর্যাদা ও স্বশাসন দেওয়া হয়েছিল। বেশ কয়েক দশক ধরে স্বশাসনের ব্যবস্থাগুলিকে দারুণভাবে খর্ব করা হয়েছে এবং রাজ্যের জনগণের বিচ্ছিন্নতার মনোভাব বেড়ে উঠেছে। একে ব্যবহার করেছে পাকিস্তানের মদতপুষ্ট বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদ এই বিরোধকে ভারতের ওপর চাপ সৃষ্টি এবং এই এলাকায় নিজেদের হস্তক্ষেপ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে। উত্তর-পূর্বাঞ্চল ও কাশ্মীরের সমস্যা দেখে বোঝা যায় জাতীয় ঐক্যের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নকে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিবেচনা করতে কীভাবে বুর্জোয়া জমিদার শ্রেণীগুলি ব্যর্থ হয়েছে।

৫·৬ সাত কোটি আদিবাসী ও উপজাতি মানুষ নির্মম পুঁজিবাদী ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক শোষণের শিকার। জমি থেকে তাঁরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছেন, অরণ্যের অধিকার থেকে তাঁরা বঞ্চিত, ঠিকাদার ও জমিদারদের সস্তা ও দাসশ্রমের রসদ হিসাবে তাঁরা কাজ করেন। কিছু রাজ্যে উপজাতি জনগণের সন্নিবদ্ধ অঞ্চল আছে যাদের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যে পূর্ণ। নিজেদের পরিচিতি সত্তা ও সংস্কৃতি বজায় রেখেই অগ্রগতির অধিকারের সপক্ষে উপজাতি জনগণের নতুন চেতনা জাগ্রত হয়েছে। পরিচিতি সত্তা এমনকি অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ায় এবং বুর্জোয়া-জমিদার শাসকদের উদাসীন নীতির কারণে উপজাতি জনগণের কিছু অংশের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদী ভাবাবেগ জন্ম নিয়েছে। তাদের অধিকার রক্ষায় উপজাতি সংখ্যাগরিষ্ঠ সন্নিহিত অঞ্চলে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি গণতান্ত্রিক ও ন্যায়সঙ্গত দাবি। পুঁজিপতি-ভূস্বামী-ঠিকাদার চক্র নেতৃত্বকে কিছু সুবিধা পাইয়ে দিয়ে উপজাতি মানুষের চিরাচরিত সংহতি বিপর্যস্ত করতে চায়। এরা উপজাতিদের ন্যায্য অধিকার অস্বীকার করে, নির্মম শক্তি প্রয়োগ করে তা দমন করে।

৫·৭ সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতির কথা বলা আছে, রাষ্ট্রের নেতৃত্বে থাকা বৃহৎ বুর্জোয়া শ্রেণীও ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রের মূল্যবোধ ঘোষণা করে থাকে। কিন্তু বুর্জোয়া শ্রেণীর বাস্তবে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রয়োগ ত্রুটিপূর্ণ।

ধর্মনিরপেক্ষতার সামগ্রিক ধারণাই তারা বিকৃত করতে চায়। তারা জনগণকে বিশ্বাস করাতে চায় যে, ধর্ম ও রাজনীতির পুরোপুরি পৃথকীকরণের বদলে ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ হলো রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক জীবনের সর্বত্র সমানভাবে হস্তক্ষেপের স্বাধীনতা আছে সব ধর্মবিশ্বাসের। ধর্মনিরপেক্ষতা-বিরোধী প্রবণতার দৃঢ় মোকাবিলার বদলে বুর্জোয়া শ্রেণী প্রায়ই তাদের সুবিধা দেয়, তাদেরই শক্তি বাড়ায়। সাম্প্রদায়িক ও ফ্যাসিস্ত ধাঁচের আর এস এস পরিচালিত জোটের শক্তিবৃদ্ধি ও কেন্দ্রে তাদের ক্ষমতা দখলের ফলে ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তির বিপদ গুরুতর হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানসমূহ, প্রশাসন, শিক্ষা ব্যবস্থা, প্রচারমাধ্যমের সাম্প্রদায়িকীকরণের পরিকল্পিত প্রয়াস চলছে। সংখ্যাগুরু সাম্প্রদায়িকতার শক্তি বৃদ্ধি সংখ্যালঘু সাম্প্রদায়িকতার শক্তিকেও জোরদার করবে এবং জাতীয় ঐক্য বিপন্ন হবে। বি জে পি এবং তাদের সাম্প্রদায়িক মঞ্চের প্রতি বৃহৎ বুর্জোয়া শ্রেণীর কোনো কোনো অংশের সমর্থন দেশের গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে গুরুতর বিপদের আশঙ্কা তৈরি করেছে।

৫·৮ সুতরাং, আমাদের পার্টি ধর্মনিরপেক্ষতার নীতির ধারাবাহিক রূপায়ণের জন্য আপসহীন সংগ্রাম চালিয়ে যেতে অঙ্গীকারবদ্ধ। এই নীতি থেকে সামান্যতম বিচ্যুতিও উন্মোচিত করে দিতে হবে, তার বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। সংখ্যাগুরু বা সংখ্যালঘু নির্বিশেষে প্রত্যেক ধর্ম সম্প্রদায়ের এবং সেই সঙ্গে যারা কোনো ধর্মে বিশ্বাসী নয় তাদেরও যেকোনো ধর্মমতে বিশ্বাস করার ও ধর্মাচরণ করার বা আদৌ না করার অধিকারকে রক্ষা করার সঙ্গে সঙ্গে পার্টির কর্তব্য জাতির অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক জীবনে ধর্মের যে কোনো ধরনের অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে লড়াই করা এবং সংস্কৃতি, শিক্ষা ও সামাজিক ক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরা। ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার উপর ভর করে যে ফ্যাসিস্ত প্রবণতা বিস্তারলাভ করছে তার বিরুদ্ধে অবশ্যই সর্বস্তরে দৃঢ়তার সঙ্গে লড়াই চালাতে হবে।

৫·৯ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য সংবিধানে স্বীকৃত অধিকারসমূহও ধনতান্ত্রিক শোষণের পরিস্থিতিতে কার্যকর করা হয় না। মুসলিম সংখ্যালঘুদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে সমান সুযোগের অভাব আছে ; বৈষম্যও আছে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, মুসলিমদের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক আক্রমণ নিয়মিত ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর এস এস ও তার সংগঠনগুলি নিয়মিতভাবে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে ঘৃণার প্ররোচনা দিয়ে যাচ্ছে। তারা খ্রীষ্টান সম্প্রদায়কেও আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু করেছে। এর ফলে সংখ্যালঘুদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতার মনোভাব ও নিরাপত্তাহীনতার জন্ম দেয়, যার থেকে জন্ম হয় মৌলবাদী প্রবণতার এবং এর ফলে ধর্মনিরপেক্ষতার

স্তম্ভগুলিই দুর্বল হয়ে পড়ে। সংখ্যালঘু সাম্প্রদায়িকতা সংখ্যালঘুদের একঘরে করে এবং সকল শোষিত জনগণের সাধারণ আন্দোলনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে শক্তিশালী করার সংগ্রামের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো সংখ্যালঘুদের অধিকারের সপক্ষে দাঁড়ানো।

৫·১০ জাতপাতের নিপীড়নের অবসান ঘটাতেও বুর্জোয়া-ভূস্বামী ব্যবস্থা ব্যর্থ হয়েছে। তফসিলী জাতির মানুষরা সবচেয়ে বেশি ভুক্তভোগী। আইনবিরুদ্ধ ঘোষিত হওয়া সত্ত্বেও দলিতরা অস্পৃশ্যতা ও অন্যান্য ধরনের বৈষম্যের শিকার। মুক্তির জন্য দলিতদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান আকাঙ্ক্ষাকে নির্মম দমন-পীড়ন ও অত্যাচারের মাধ্যমে মোকাবিলা করার চেষ্টা হয়। দলিতদের অধিকার প্রয়োগের মধ্যে একটি গণতান্ত্রিক উপাদান আছে, যা সমাজের সবচেয়ে নিপীড়িত অংশের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন। জাতপাতে বিভাজিত সমাজে অনগ্রসর সম্প্রদায়ও তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে।

৫·১১ একই সঙ্গে ভোট ব্যাঙ্ক সংহত করার সংকীর্ণ লক্ষ্যে ও অভিন্ন গণতান্ত্রিক সংগ্রাম থেকে এই সব পিছিয়ে পড়া অংশকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার উদ্দেশ্যে বিশুদ্ধ জাতপাতের আবেদনের ভিত্তিতে একটি তৎপরতাও চলছে। এরা জাতপাতের বিভাজনকে টিকিয়ে রাখতেই চায়। অনেক জাতপাতভিত্তিক নেতা এবং বুর্জোয়া রাজনৈতিক দলগুলির কিছু নেতা জাতপাতের ভিত্তিতে মেরুকরণকে সংকীর্ণ নির্বাচনী সুবিধালাভের স্বার্থে ব্যবহার করেন। সমস্ত জাত সম্প্রদায়ের নিপীড়িত অংশের অভিন্ন সংগ্রাম গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এদের বৈরিতা রয়েছে। তারা জমি, মজুরির মতো মৌলিক শ্রেণীগত প্রশ্ন এবং ভূস্বামীতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রশ্নকে এড়িয়ে যায় যদিও পুরনো সামাজিক ব্যবস্থাকে উপড়ে ফেলার ভিত্তিই হলো এইসব বিষয়।

৫·১২ জাতপাতের নিপীড়ন ও বৈষম্যের সমস্যার ইতিহাস দীর্ঘ, প্রাক-ধনতান্ত্রিক সামাজিক ব্যবস্থার গভীরে তার শেকড় প্রোথিত। ধনতান্ত্রিক বিকাশের অধীন সমাজ চালু জাতপাত ব্যবস্থার সঙ্গে সমঝোতা করেছে। ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী নিজেরাই জাতপাতের সংস্কার লালন-পালন করে। শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্যের পূর্বশর্ত জাত ব্যবস্থার এবং দলিতদের নিপীড়নের বিরুদ্ধে ঐক্য, কেননা দলিত জনসংখ্যার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই শ্রমজীবী শ্রেণীগুলির অঙ্গ। জাতব্যবস্থার অবসানের জন্য সংগ্রাম এবং সমাজ সংস্কার আন্দোলনের মাধ্যমে সমস্ত রকমের সামাজিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম গণতান্ত্রিক বিপ্লবের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। জাত নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শ্রেণী শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

৫·১৩ স্বাধীনতা সংগ্রামে সমানতালে অংশ নিয়েছিলেন ভারতের মহিলারা। স্বাধীনতার পরে শতাব্দীপ্রাচীন সামন্তযুগীয় এবং লিঙ্গভিত্তিক অত্যাচারের শৃঙ্খল থেকে মুক্তির আশা করেছিলেন তাঁরা। কিন্তু না, অগ্রগতি তো ঘটেইনি ; বরং পাঁচ দশকের বুর্জোয়া-জমিদার শাসন সর্বক্ষেত্রে পুরুষতন্ত্রকেই টিকিয়ে রেখেছে। বিভিন্ন স্তরে মহিলারা শোষিত হন — মহিলা হিসেবে, শ্রমিক হিসেবে, নাগরিক হিসাবে। উদারীকরণের পথ বেয়ে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উভয় ক্ষেত্রেই এসেছে নতুন নতুন লিঙ্গভিত্তিক শোষণ যা মহিলাদের বিরুদ্ধে হিংসাকে বাড়িয়ে চলেছে। মহিলাদের অগ্রগতির প্রাথমিক শর্ত হলো অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে স্বাধীন ভূমিকা। অসম মর্যাদার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ এবং সমতার লক্ষ্যে নারীদের আন্দোলন সামাজিক মুক্তির সংগ্রামের অঙ্গ।

৫·১৪ বুর্জোয়া-জমিদার শাসনে পঞ্চাশ বছরে রাষ্ট্রক্ষমতার সমস্ত প্রতিষ্ঠানের অবক্ষয় ঘটেছে। প্রশাসনিক ব্যবস্থা দাঁড়িয়ে আছে একটি অত্যন্ত কেন্দ্রীভূত আমলাতন্ত্রের ওপর যা ধনতান্ত্রিক বিকাশের প্রতিফলন। এর ফলে ক্ষমতা উপরতলায় কেন্দ্রীভূত এবং সুবিধাভোগী আমলাদের মাধ্যমে তা প্রয়োগ হয়। এরা জনসাধারণের সঙ্গে সম্পর্কহীন এবং শোষকশ্রেণীর স্বার্থের অনুগত সেবক। আমলাতন্ত্রের বিপুল আয়তনপ্রাপ্তি, শাসক শ্রেণীগুলির সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এবং আমলাতন্ত্রের অবাধ দুর্নীতি সমাজের গণতান্ত্রিক কাঠামোকে দুর্বল করে দেবার উপাদান হিসাবে কাজ করছে।

৫·১৫ বিচারবিভাগের পাল্লা শ্রমিক, কৃষক ও শ্রমজীবী জনগণের অন্যান্য অংশের বিপক্ষেই ঝুঁকে আছে। আনুষ্ঠানিকভাবে ধনী-দরিদ্র নীতিগতভাবে সমান বলে ঘোষিত হলেও বিচারব্যবস্থা মর্মবস্তুর দিক থেকে শোষক শ্রেণীগুলির স্বার্থরক্ষা করে এবং তাদের শ্রেণীশাসনের পক্ষেই দাঁড়ায়। এমনকি বিচারবিভাগ ও প্রশাসনিক বিভাগের মধ্যে পৃথকীকরণের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক নীতিও পুরোপুরি অনুসৃত হয় না এবং বিচারবিভাগ প্রশাসনের প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণের অধীন। গণতান্ত্রিক নীতি এবং সংবিধানের মৌলিক অধিকারকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরে এমন রায়কে শাসকশ্রেণী বানচাল করে দেয় তার নজির আছে। বিচারপতিদের দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করার কোনো কার্যকরী ব্যবস্থা না থাকায় বিচারপতিদের কোনো কোনো অংশের মধ্যে কিছু দুর্নীতিমূলক কার্যকলাপের অভিযোগ উঠছে যার ফলে বিচার ব্যবস্থার প্রতি জনগণের আস্থা দুর্বল হয়ে পড়ছে।

৫·১৬ স্বাধীন ভারতে সামরিক বাহিনীর কাঠামো আজও ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকারের চিহ্ন বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। দেশের সীমান্ত রক্ষা করাই যখন সশস্ত্র বাহিনীর কাছ থেকে প্রত্যাশিত তখন শোষিত জনগণের স্বার্থের সঙ্গে শাসকশ্রেণীর স্বার্থের প্রকাশ্য সংঘাত বেধে গেলে তারা ক্রমশ বেশি বেশি করে সশস্ত্র বাহিনী ও আধা সামরিক বাহিনীর ওপর নির্ভর করে। সামরিক বাহিনীর সৈন্যরা আসে কৃষক এবং শ্রমজীবী জনগণের মধ্য থেকে এবং তাদের পরিশ্রমসাধ্য কর্তব্য পালন করতে হয়। শাসকশ্রেণী এই সব বাহিনীর কর্মীদের জনগণের থেকে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে রাখে, গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রাখে। জনগণের আন্দোলন দমনের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হয় পুলিস বাহিনী। তারা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনের হাতিয়ার ও দুর্নীতির শিকার এবং অনেক ক্ষেত্রে দরিদ্র মানুষের বিরুদ্ধে শোষণযন্ত্রের অংশ।

৫·১৭ গোটা দেশের হিসাবে শ্রমিকশ্রেণী, কৃষকশ্রেণী ও মধ্যবিত্তশ্রেণীর তুলনায় বুর্জোয়াশ্রেণী ও তার জমিদার মিত্ররা অতীব সংখ্যালঘিষ্ঠ অংশ, কিন্তু জমি, মূলধন ও উৎপাদনের সমস্ত উপকরণের উপর মালিকানার জোরে বুর্জোয়া ও তার জমিদার মিত্ররা শ্রমিক, কৃষক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপর শাসন ও শোষণ চালিয়ে থাকে। ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রশক্তি এবং তার সরকার গণতান্ত্রিক সংসদীয় ব্যবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠের দ্বারা নির্বাচিত হলেও — রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মর্মবস্তুর দিক থেকে সংখ্যালঘু অংশেরই প্রতিনিধিত্ব করে।

৫·১৮ ভারতীয় সাধারণতন্ত্রের সংবিধানে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত সংসদের ব্যবস্থা করা হয়েছে, এবং জনগণকে কিছু মৌলিক অধিকার দেওয়া হয়েছে। এই সব অধিকারের অনেকগুলিকেই রাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষ ভুলভাবে ব্যাখ্যা করে, বিকৃত করে, এমনকি লঙ্ঘনও করে থাকে। যখন শ্রমিক, কৃষক ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক অংশের সংগ্রামের প্রশ্ন আসে, তখন তাদের মৌলিক অধিকারের প্রয়োগ কার্যত বন্ধ হয়ে যায় এমনকি মাসের পর মাস, বছরের পর বছর বিধিনিষেধ জারি রেখে এক একটা গোটা এলাকায়, লক্ষ লক্ষ লোক-অধ্যুষিত এক একটা গোটা অঞ্চলে সভা সমাবেশের স্বাধীনতাকে অস্বীকার করা হয়। শ্রমিক, কৃষক ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক মানুষ যখন তাঁদের নিজেদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার ও দাবি-দাওয়া রক্ষা করার উদ্দেশ্যে তৎপর হয়ে ওঠেন, তখন রাষ্ট্রের বিভিন্ন যন্ত্রের হিংস্রতা তাদের বিরুদ্ধে নৃশংস হয়ে ওঠে। বিনাবিচারে আটক রাখার দানবীয় আইন যেন নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনুরূপভাবে, সংবিধানে বিধৃত জাতীয় জরুরী অবস্থা সংক্রান্ত ধারাগুলিরও অপব্যবহার করা হচ্ছে এবং গণতান্ত্রিক সংগ্রামকে দমন

করার জন্য অর্ডিন্যান্স জারি করা হচ্ছে। ১৯৭৫-এ অভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থা জারি গণতন্ত্রের প্রতি সবচেয়ে মারাত্মক বিপদ ছিল।

৫·১৯ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের চাপে পঞ্চায়েত ও স্থানীয় সংস্থা পর্যন্ত প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণের জন্য কিছু পদক্ষেপ নিতে সরকার বাধ্য হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা ও ত্রিপুরায় বাম নেতৃত্বাধীন সরকারগুলি ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ও ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করে। কিন্তু বামপন্থী নেতৃত্বাধীন রাজ্যগুলি ছাড়া পঞ্চায়েতরাজ প্রতিষ্ঠানকে গণতন্ত্র সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ব্যবহার করা হচ্ছে না, বরং গ্রামাঞ্চলে জমিদার, মহাজন, ঠিকাদারদের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে।

৫·২০ দশকের পর দশক ধরে চলে আসা বুর্জোয়া জমিদার শাসনে ভারতীয় জনগণের সাংস্কৃতিক উন্নয়ন রুদ্ধ হয়ে গেছে। ঐতিহ্য ও ধর্মের নামে অতীব ক্ষতিকারক রীতিনীতি ও মূল্যবোধকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, যা মহিলা ও শোষিত জাতির পক্ষে অবমাননাকর। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে যা কিছু প্রগতিশীল ও সুস্থ তাকে সাম্প্রদায়িক মতাদর্শ দ্বারা খাটো করা হচ্ছে। বুর্জোয়া সংস্কৃতি তার বেশিরভাগ সেকেলে এবং জাতপাত ভিত্তিক মূল্যবোধকে ধরে রেখেছে। রাষ্ট্র সাক্ষরতার বিষয়েই নির্বোধসুলভ অবহেলা প্রকাশ করে থাকে, জনগণের সাংস্কৃতিক উন্নয়ন তো দূরের কথা। শোষক শ্রেণীগুলিও সাম্রাজ্যবাদী সংস্থাগুলি মুদ্রণ ও ইলেকট্রনিক মাধ্যম, রেডিও, টেলিভিশন নেটওয়ার্কে আধিপত্যের মাধ্যমে সংবাদপত্র, সভা-সমাবেশ ও প্রচারের স্বাধীনতাকে পুর্ণমাত্রায় ব্যবহার করে। তাদের বিপুল সম্পদের সঙ্গে শ্রমজীবী জনগণের প্রতিযোগিতা করা সম্ভব নয় এবং এই কারণেই আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি সত্ত্বেও তারা এইসব অধিকার ব্যবহারে অশক্ত।

৫·২১ বিপুল পরিমাণ কালো টাকা যা সমাজে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে এবং দুর্নীতির লক্ষণীয় বৃদ্ধি বুর্জোয়া-জমিদার রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানসমূহের অবক্ষয়ের প্রেক্ষাপটে রয়েছে। উদারীকরণের প্রক্রিয়া সর্বোচ্চ স্তরগুলিতে বড়মাপের দুর্নীতির মুখ খুলে দিয়েছে। সরকারী পদাধিকারী, শীর্ষস্থানীয় আমলা এবং বুর্জোয়া রাজনীতিকদের নিয়ে তৈরি হয়েছে দুর্নীতির এক অশুভ চক্র যা আইনের তোয়াক্কা করে না, জনগণের তহবিল লুণ্ঠনে সাহায্য করে। নির্বাচনে অর্থ শক্তির ব্যবহার দারুণভাবে বৃদ্ধি, রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন, বুথ দখল ও রিগিং সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সামনে এক গুরুতর বিপদস্বরূপ।

৫·২২ অবশ্য গণতন্ত্রের জন্য এবং নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য সংগ্রামে প্রাপ্ত বয়স্কদের সার্বজনীন ভোটাধিকার, সংসদ ও রাজ্য আইনসভা জনগণের

হাতিয়ার হিসাবে কাজ করতে পারে। যখন সংসদীয় গণতন্ত্রের উপর আক্রমণ হয়েছে, যেমন অভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থার সময়ে হয়েছিল, তখন জনসাধারণ সেই স্বৈরতান্ত্রিক পদক্ষেপের বিরোধিতা করেছিলেন। বুর্জোয়াদের শ্রেণী শাসনের একটি রূপ হলেও, ভারতের বর্তমান সংসদীয় ব্যবস্থা জনগণের পক্ষে একটি অগ্রগতির প্রতীকও বটে। নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য, কিছু পরিমাণে রাষ্ট্রের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার জন্য এবং গণতন্ত্র ও সামাজিক প্রগতির সংগ্রামকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য তা জনগণের কাছে কিছুটা সুযোগ এনে দিয়েছে।

৫·২৩ সংসদীয় ব্যবস্থা ও গণতন্ত্রের বিপদ শ্রমজীবী জনগণ ও তাদের স্বার্থরক্ষাকারী পার্টিগুলির কাছ থেকে আসে না। এই বিপদ আসে শোষকশ্রেণীর কাছ থেকে। নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থ রক্ষার জন্য তারাই সংসদীয় ব্যবস্থাকে একটি হাতিয়ারে পরিণত করে ভেতর ও বাইরে থেকে এই ব্যবস্থাকে খর্ব করে। যখন জনগণ তাদের লক্ষ্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সংসদীয় ব্যবস্থাকে ব্যবহার করতে শুরু করেন এবং বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণী ও জমিদারদের প্রভাব থেকে দূরে সরে যান, এইসব শ্রেণীগুলি সংসদীয় গণতন্ত্রকে পদদলিত করতে দ্বিধাবোধ করে না। কেন্দ্র বহুবার নির্বাচিত রাজ্য সরকার ভেঙে দিয়ে তা করেওছে। শাসকশ্রেণী কত মারাত্মক পর্যায় পর্যন্ত যেতে পারে পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরায় আধা ফ্যাসিস্ত সন্ত্রাস এবং এইসব রাজ্যে সমস্ত সাংবিধানিক বিধিব্যবস্থার নির্লজ্জ লঙ্ঘনের ঘটনা তার সুস্পষ্ট উদাহরণ রেখেছে। রাষ্ট্রপতি ধাঁচের সরকার তৈরির কথাবার্তা এবং সংসদীয় গণতন্ত্রকে ছাঁটকাট করা স্বৈরতান্ত্রিক লক্ষণ, যা উদারীকরণের রাজত্বে ও আন্তর্জাতিক ফিনান্স পুঁজির ক্রমবর্ধমান চাপের মুখে আরো বেড়েছে। এইসব বিপদের বিরুদ্ধে জনস্বার্থে সংসদীয় ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে রক্ষা করা এবং সংসদ-বহির্ভূত কাজকর্মের সঙ্গে এইসব প্রতিষ্ঠানকেও দক্ষভাবে ব্যবহার করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৬

জনগণতন্ত্র ও তার কর্মসূচী

৬·১ অভিজ্ঞতা দেখায় যে, বর্তমান বুর্জোয়া-জমিদার শাসনে পশ্চাৎপদতা, দারিদ্র্য, ক্ষুধা, বেকারী এবং শোষণ থেকে জনগণের মুক্তি পাবার কোনো আশা নেই। স্বাধীনতার সময় থেকেই বৃহৎ বুর্জোয়ারা নিরবচ্ছিন্নভাবে রাষ্ট্র ক্ষমতায়

আছে। জনগণকে বঞ্চিত করে নিজেদের শ্রেণী অবস্থানকে শক্তিশালী করার জন্য রাষ্ট্রক্ষমতাকে তারা ব্যবহার করছে; অপরদিকে সাম্রাজ্যবাদ ও বৃহৎ জমিদারতন্ত্রের সাথে সমঝোতা ও দরকষাকষি করছে। অগ্রসর ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে ধনতন্ত্র গড়ে উঠেছিল উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণীর দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাক্-ধনতান্ত্রিক সমাজের ভস্মস্তূপের উপরে। ভারতে এরূপ ঘটেনি, এখানে প্রাক্ ধনতান্ত্রিক সমাজের উপর ধনতন্ত্রকে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। ব্রিটিশ উপনিবেশতন্ত্রীরা তাদের শাসনে অথবা স্বাধীনতার পরে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী কেউই প্রাক্-ধনতান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে বিধ্বংসী আঘাত হানেনি। ধনতন্ত্রের অবাধ বিকাশের প্রয়োজনে প্রাক্-ধনতান্ত্রিক সমাজের ধ্বংস একটি অন্যতম গুরত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত। সেই কারণেই বর্তমান ভারতীয় সমাজ বর্ণগত, সম্প্রদায়গত ও উপজাতিগত প্রতিষ্ঠানাদিসহ একচেটিয়া ধনতান্ত্রিক আধিপত্যের এক বিচিত্র মিশ্রণ। সুতরাং যাতে করে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সর্বাপেক্ষা দ্রুত পূর্ণতা সাধন ও সমাজতন্ত্রে উত্তরণের ক্ষেত্র রচনা সহজসাধ্য করা যায় সেইজন্য যারা প্রাক্-ধনতান্ত্রিক সমাজের ধ্বংস সাধনে আগ্রহশীল তেমন সমস্ত প্রগতিশীল শক্তিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করার এবং তার অভ্যন্তরে বৈপ্লবিক শক্তিগুলির সংহতি সাধনের দায়িত্ব এসে পড়েছে শ্রমিকশ্রেণী ও তার পার্টির উপরে।

৬·২ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র লক্ষ্য সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম প্রতিষ্ঠা এবং এই লক্ষ্যের প্রতি পার্টি দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ। এটা সুস্পষ্ট যে, বৃহৎ বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে বুর্জোয়া-জমিদার সরকার এবং বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থায় এই লক্ষ্যে উপনীত হওয়া অসম্ভব। একমাত্র সর্বহারার রাষ্ট্রব্যবস্থায় প্রকৃত সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব। সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের লক্ষ্যের প্রতি একনিষ্ঠ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) অর্থনৈতিক বিকাশের এবং শ্রমিকশ্রেণী ও তার রাজনৈতিক সংগঠনের রাজনৈতিক ও ভাবাদর্শগত পরিপক্কতার মাত্রা বিবেচনা করে দৃঢ় মৈত্রীর ভিত্তিতে শ্রমিক এবং কৃষকের সমস্ত প্রকৃত সামন্ততন্ত্র-বিরোধী, একচেটিয়া পুঁজিপতি-বিরোধী ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী এবং গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির কোয়ালিশনের ভিত্তিতে জনগণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাকে আশু লক্ষ্য হিসাবে জনগণের সামনে উপস্থিত করছে। এর জন্য সর্বপ্রথম ও সর্বাগ্রে প্রয়োজন বর্তমান বুর্জোয়া-জমিদার শাসনের অপসারণ করে তার জায়গায় জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। ভারতীয় বিপ্লবের অসমাপ্ত মৌল গণতান্ত্রিক কর্তব্যগুলি পালন করা এবং দেশকে সমাজতন্ত্রের অভিমুখে পরিচালনার পথ প্রস্তুত করার এটাই হচ্ছে একমাত্র রাস্তা। যে কর্তব্যগুলি ও কর্মসূচী জনগণতান্ত্রিক সরকার পালন ও রূপায়িত করবে তা হলো :

৬·৩ **রাষ্ট্রকাঠামোর ক্ষেত্রে** : দেশে বসবাসকারী বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীগুলির প্রকৃত সমতা ও স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তিতে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) ভারতীয় ইউনিয়নের ঐক্য রক্ষা ও বৃদ্ধির জন্য এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামোর বিকাশের জন্য কাজ করবে যথা :

(i) জনগণই সার্বভৌম। রাষ্ট্রক্ষমতার সমস্ত অঙ্গগুলি বা সংস্থাগুলি জনগণের কাছে দায়বদ্ধ থাকবে। প্রাপ্তবয়স্ক সার্বজনীন নির্বাচনের ভিত্তিতে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরাই হবেন সর্বোচ্চ কর্তৃত্বের অধিকারী। আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ও অপসারণের নীতির ভিত্তিতে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। সর্বভারতীয় কেন্দ্রে দুটি কক্ষ থাকবে—লোকসভা ও রাজ্যসভা। পর্যাপ্ত মহিলা প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা হবে।

(ii) ভারতীয় ইউনিয়নের সকল রাজ্যগুলির প্রকৃত স্বায়ত্তশাসন ও সমান ক্ষমতা থাকবে। উপজাতি এলাকা বা সেইসব এলাকা যেখানে জনগোষ্ঠীগত নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য রয়েছে এবং যা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল দ্বারা পৃথক রূপে চিহ্নিত তাদের সংশ্লিষ্ট রাজ্যের মধ্যেই আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেওয়া হবে এবং তাদের বিকাশের জন্য পূর্ণ সাহায্য পাবে।

(iii) রাজ্যস্তরে কোন উচ্চকক্ষ থাকবে না। রাজ্যগুলির জন্য উপর থেকে নিযুক্ত কোন রাজ্যপাল থাকবে না। সমস্ত প্রশাসনিক কৃত্যগুলি সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির অথবা স্থানীয় কর্তৃত্বের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীন থাকবে। রাজ্যগুলি সকল ভারতীয় নাগরিকের প্রতি সমান আচরণ করবে এবং কোনও প্রকারের বর্ণ সম্প্রদায়, ধর্ম, লিঙ্গ ও জাতিগত কারণে বৈষম্য থাকবে না।

(iv) লোকসভা ও কেন্দ্রীয় প্রশাসনে সকল জাতীয় ভাষাগুলির সমতা স্বীকৃত হবে। লোকসভা সদস্যদের যে কোনো জাতীয় ভাষায় বক্তৃতা দেবার অধিকার থাকবে এবং সঙ্গে সঙ্গে তা অন্যান্য সকল জাতীয় ভাষায় অনুবাদ করার ব্যবস্থা থাকবে। সমস্ত জাতীয় ভাষায় সমস্ত আইনের, সরকারী আদেশগুলির ও প্রস্তাবগুলির অনুবাদ পাওয়া যাবে। অন্যান্য ভাষাকে বাদ দিয়ে সরকারী ভাষারূপে একমাত্র হিন্দির ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হবে না। কেবলমাত্র সমস্ত ভাষাগুলিকে সমমর্যাদা দেওয়ার মধ্য দিয়েই হিন্দি সারাদেশে যোগাযোগের ভাষারূপে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠতে পারে। ততদিন পর্যন্ত হিন্দি ও ইংরাজী ভাষার ব্যবহারের বর্তমান ব্যবস্থা বজায় থাকবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত মাতৃভাষায় শিক্ষালাভের অধিকার জনগণের থাকবে। সমস্ত সরকারী ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক ভাষারূপে নির্দিষ্ট ভাষাভাষী রাজ্যের ঐ

নির্দিষ্ট ভাষার ব্যবহার সুনিশ্চিত করা হবে। প্রয়োজনে এক বা একাধিক সংখ্যালঘু জনগণের অথবা একটি অঞ্চলের ভাষার ব্যবহার কার্যকরী করা হবে। উর্দুভাষা ও তার বর্ণলিপিকে রক্ষা করা হবে।

(v) অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে এবং বিভিন্ন রাজ্যের জনগণের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতায় উৎসাহদান এবং তা বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা করে জনগণতান্ত্রিক সরকার ভারতের ঐক্যকে সুসংহত করবে। জাতিগত বৈচিত্র্য, বিভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতির মর্যাদা দেওয়া হবে এবং বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য শক্তিশালী করার লক্ষ্যে নীতিগুচ্ছ প্রণয়ন করা হবে। অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর ও অপেক্ষাকৃত দুর্বল রাজ্য, অঞ্চল এবং এলাকাগুলির দ্রুত অনগ্রসরতা কাটিয়ে ওঠার জন্য আর্থিক ও অন্যান্য সহায়তা দেবার জন্য বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হবে।

(vi) স্থানীয় প্রশাসনের ক্ষেত্রে জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, গ্রামীণ স্তর এবং তদূর্ধ্বে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে স্থানীয় সংস্থা সমূহের বিস্তার নিশ্চিত করবে। এই সমস্ত সংস্থাগুলিকে যথোপযুক্ত ক্ষমতা, দায়িত্ব এবং আর্থিক সম্বল সম্পন্ন করে তোলা হবে। স্থানীয় সংস্থার কার্যক্রমে জনগণের সক্রিয় ভূমিকাকে নিশ্চিত করার জন্য সমস্ত প্রয়াস নেওয়া হবে।

(vii) আমাদের যাবতীয় সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্থাগুলিতে গণতান্ত্রিক মনোভাব সঞ্চারিত করার জন্য জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র চেষ্টা করবে। জাতীয় জীবনের প্রতিটি বিষয়ের উপর গণতান্ত্রিক উদ্যোগ ও নিয়ন্ত্রণ বিস্তার করবে। এ ব্যাপারে রাজনৈতিক দল, ট্রেড ইউনিয়ন, কৃষক ও খেতমজুর সমিতিগুলি ও মেহনতী মানুষের অন্যান্য শ্রেণীগত ও গণসংগঠনগুলি প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করবে। দেশের আইন প্রণয়নকারী ও কার্যনির্বাহী যন্ত্র যাতে অবিরত জনগণের গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষার প্রতি সাড়া দিতে থাকে সরকার সেজন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং জনগণ ও তাদের সংগঠনগুলি প্রশাসন ও রাষ্ট্রের কাজকর্মে সক্রিয় অংশগ্রহণে যাতে আকৃষ্ট হয় তা সুনিশ্চিত করবে। রাষ্ট্র ও প্রশাসনে আমলাতান্ত্রিক আচার-আচরণগুলি দূর করার কাজ করবে।

(viii) জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কালো টাকা উদ্ধার, দুর্নীতি নির্মূলীকরণ, অর্থনৈতিক অপরাধ ও সরকারী পদাধিকারীদের দুর্নীতিমূলক কাজকর্মের শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করবে।

(ix) বিচারকার্যে গণতান্ত্রিক পরিবর্তন করা হবে। দ্রুত ও ন্যায়বিচার

সুনিশ্চিত করা হবে। আইনী প্রতিবিধান সহজলভ্য করার জন্য অভাবী মানুষদের বিনা খরচে আইনগত সাহায্য ও পরামর্শ দেওয়া হবে।

(x) জনগণতান্ত্রিক সরকার দেশপ্রেম, গণতন্ত্র ও জনগণের সেবার প্রেরণায় সশস্ত্রবাহিনীর সদস্যদের অনুপ্রাণিত করবে। তাদের জন্য জীবনযাপনের ভালো মান, চাকরির ভালো শর্তাবলী, সাংস্কৃতিক সুযোগ-সুবিধা, সন্তানদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। সমস্ত সক্ষমদেহী ব্যক্তিকে সামরিক শিক্ষা নিতে এবং জাতীয় স্বাধীনতা ও তা রক্ষার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হতে উৎসাহী করবে।

(xi) পূর্ণ নাগরিক অধিকারের গ্যারান্টি থাকবে। দৈহিক নিরাপত্তা অলঙ্ঘনীয় ও বসবাসের অধিকার, বিনা বিচারে কাউকে আটকে না রাখা এবং বিবেক, ধর্মীয় বিশ্বাস ও আরাধনা, বক্তৃতা, সংবাদপত্র ও সভা অনুষ্ঠান, ধর্মঘট ও সঙ্ঘ সমিতি, রাজনৈতিক দল গঠনের স্বাধীনতা, যাতায়াত ও জীবিকার স্বাধীনতা, বিরোধিতা করার অধিকার সুনিশ্চিত করা হবে।

(xii) প্রত্যেক নাগরিকের কাজ করার অধিকার মৌলিক অধিকার হিসাবে গ্যারান্টি করা হবে, সকল নাগরিকের সমান অধিকার, ধর্ম, বর্ণ, নর-নারী, জাতি ও জাতীয় জনসমাজের নির্বিশেষে সমান কাজের জন্য সমান পারিশ্রমিক নিশ্চিত করা হবে। বেতন ও আয়ের ক্ষেত্রে বিপুল বৈষম্য ধাপে ধাপে কমিয়ে আনা হবে।

(xiii) একবর্ণের মানুষের উপর অন্য বর্ণের সামাজিক নিপীড়নের অবসান করা হবে এবং অস্পৃশ্যতা ও সমস্ত সামাজিক বৈষম্য আইনের দ্বারা দণ্ডনীয় হবে। তফসিলী সম্প্রদায়, আদিবাসী ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীগুলির জন্য চাকরি ও শিক্ষাসংক্রান্ত সুযোগের জন্য বিশেষ সুবিধার ব্যবস্থা করা হবে।

(xiv) মহিলাদের প্রতি সামাজিক বৈষম্য ও অসমতা দূর করা হবে। জমিসহ সম্পত্তির উত্তরাধিকার, সমস্ত সম্প্রদায়ের মহিলাদের জন্য সমানাধিকারের ভিত্তিতে সুরক্ষাসূচক সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পারিবারিক আইন বলবৎ করা, এবং জীবিকা ও চাকরি প্রভৃতির ক্ষেত্রে সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা করা হবে। পারিবারিক কাঠামোকে গণতান্ত্রিক করার অংশ হিসাবে শিশু পরিচর্যা ও গার্হস্থ্য কর্মের জন্য উপযুক্ত সহযোগী ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে।

(xv) রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র সুনিশ্চিত করা হবে। রাষ্ট্রের ব্যাপারে ও দেশের রাজনৈতিক জীবনে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের হস্তক্ষেপ নিষিদ্ধ করা হবে। ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের রক্ষা করা হবে এবং তাদের বিরুদ্ধে যে কোনো বৈষম্যমূলক আচরণ নিষিদ্ধ করা হবে।

(xvi) সরকারী শিক্ষা ব্যবস্থা এমনভাবে উন্নত করতে হবে যাতে সর্বস্তরে সুসংহত ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষা দেওয়া হয়। মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত বিনা খরচে বাধ্যতামূলক শিক্ষার গ্যারান্টি থাকবে। শিক্ষার ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র সুনিশ্চিত করা হবে। উচ্চশিক্ষা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে আধুনিক ও সময়োপযোগী করা হবে। এক ব্যাপক সংখ্যক গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থা মারফত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতি ঘটানো হবে। ক্রীড়ার উন্নতিতে সুসংহত ক্রীড়ানীতি গ্রহণ করা হবে।

(xvii) বিনা খরচে স্বাস্থ্যরক্ষা, চিকিৎসা ও প্রসূতি সেবাকেন্দ্রের ব্যাপক ব্যবস্থা করা হবে। এবং শিশুদের জন্য নার্সারি ও ক্রেশ, মেহনতী মানুষের জন্য বিশ্রামাবাস ও অবসর বিনোদন কেন্দ্র ও বৃদ্ধ বয়েসে পেনশন গ্যারান্টি করা হবে। জনগণতান্ত্রিক সরকার একটি জবরদস্তিমূলক নয় এমন একটি জনসংখ্যা নীতি নেবে যাতে পুরুষ ও মহিলা উভয়ের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনার চেতনা গড়ে ওঠে।

(xviii) পরিবেশ রক্ষার জন্য সর্বাঙ্গীণ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। জৈবিক ভারসাম্য বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তাকে মনে রেখে উন্নয়নের কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে। দেশের জীব-বৈচিত্র্য এবং জৈবিক সম্পদসমূহ সাম্রাজ্যবাদী শোষণের হাত থেকে রক্ষা করা হবে।

(xix) প্রতিবন্ধীদের সমাজভুক্ত পূর্ণ নাগরিক হিসাবে বেঁচে থাকার অধিকার সুনিশ্চিত করা হবে। বয়স্ক ব্যক্তিদের মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপনের অধিকারকে রাষ্ট্র সযত্নে গুরুত্ব দিয়ে দেখবে। সামগ্রিকভাবে, সামাজিক অধিকারগুলি যা বুনিয়াদি অধিকার হিসাবে স্বীকৃত তা জনগণতন্ত্রের মূলনীতি রচনা করবে।

(xx) জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সরকার গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির প্রগতিশীল গণসংস্কৃতির বিকাশের জন্য জনগণের সৃজনশীল প্রতিভার উন্মেষে উৎসাহ দেবে। জনগণের বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক জীবন সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে সাহিত্য, শিল্পকলা ও সংস্কৃতির লালন-পালন, উৎসাহদান ও বিকাশের জন্য এই সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করবে। বর্ণ, লিঙ্গ পক্ষপাত, সাম্প্রদায়িক অন্ধ সংস্কার, গোলামি ও কুসংস্কারদূষিত মনোভাব থেকে মুক্ত হবার জন্য জনগণকে সাহায্য ও সহযোগিতা দেওয়া হবে। এই সরকার বৈজ্ঞানিক মনস্কতা বিকাশে উৎসাহ দেবে। সমগ্র দেশের গণতান্ত্রিক জনগণের সাধারণ আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সম্মিলিতভাবে আদিবাসী জনসমাজ সমেত প্রত্যেক জাতীয় জনসমাজকে তাদের নিজস্ব সুস্পষ্ট ভাষা-সংস্কৃতি ও জীবনধারার বিকাশ সাধনে সাহায্য করবে।

বর্ণগত ও জাতিগত ঘৃণাকে পরিত্যাগ করে জনসাধারণের যাতে অন্য দেশের জনগণের প্রতি বন্ধুত্বের মানসিকতা গড়ে ওঠে তার ব্যবস্থা করা হবে।

(xxi) প্রচার মাধ্যমের উন্নয়ন করা হবে। বৈদ্যুতিন মাধ্যমে গণসম্প্রচার ব্যবস্থার উপর জোর দেওয়া হবে। ব্যক্তি মালিকানার হাতে ও বিদেশী মালিকানার হাতে ভারতীয় প্রচার মাধ্যমের কেন্দ্রীভবন হতে দেওয়া হবে না। গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ ও দায়বদ্ধতা সুনিশ্চিত করা হবে।

৬·৪ কৃষি ও কৃষক সমস্যার ক্ষেত্রে :

ভারতের অর্থনীতি কৃষি-ভিত্তিক। শতকরা ৭০ ভাগ মানুষ গ্রামীণ এলাকায় বসবাস করেন। তাই দেশের সুসংহত অর্থনৈতিক বিকাশের চাবিকাঠি হলো কৃষির উন্নতি ও কৃষকদের জীবন-মানের উন্নতি।

এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য জনগণতান্ত্রিক সরকার নিম্নোক্ত কাজ করবে :

(i) আমূল ভূমিসংস্কারের দ্বারা জমিদারি ব্যবস্থার অবলুপ্তি ঘটানো হবে এবং কৃষিমজুর ও গরিব চাষীদের মধ্যে বিনামূল্যে জমি বিতরণ করা হবে।

(ii) মহাজন ও জমিদারদের কাছে কৃষক, কৃষিশ্রমিক ও ছোট কারিগরদের যে ঋণ আছে তা বাতিল করা হবে।

(iii) বৃহৎ ব্যবসায়ী ও বহুজাতিক কর্পোরেশনের হাত থেকে এবং মূল্যের দ্রুত ওঠানামা থেকে কৃষকদের রক্ষা করার জন্য রাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন বাজার-ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। কৃষক ও কারিগর ও খেতমজুরদের জন্য দীর্ঘমেয়াদী ও স্বল্প সুদে ঋণের এবং কৃষিজাত দ্রব্যাদির জন্য ন্যায্য দামের ব্যবস্থা করা হবে।

(iv) সেচ ও বৈদ্যুতিক সুযোগ সুবিধাকে বৃদ্ধির সর্বোচ্চ স্তরে নিয়ে যাওয়া হবে এবং এগুলির যথাযথ ও সমব্যবহারের বন্দোবস্ত করা হবে। কৃষিক্ষেত্রে দেশীয় গবেষণা বিকাশে উৎসাহ দেওয়া হবে। উন্নত ধরনের বীজ, আধুনিক কৃৎকৌশল ব্যবহারের মারফত উৎপাদনশীলতা বাড়াতে কৃষকদের সহায়তা করা হবে।

(v) কৃষি শ্রমিকদের জন্য উপযুক্ত মজুরি, সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং জীবনধারণের নিশ্চয়তা দেওয়া হবে।

(vi) কৃষি এবং অন্যান্য উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছাসেবামূলক ভিত্তিতে কৃষক ও কারিগরদের সমবায় গঠনে উৎসাহ দান।

(vii) জনসাধারণের কাছে সস্তায় খাদ্যশস্য ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ করার জন্য একটি সুসংহত গণবন্টন ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে।

৬·৫ অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিভিন্ন স্তর এবং বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক ধাঁচের সমন্বয়ে ভারত একটি বিশাল দেশ। তাই, অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় উৎপাদিকা শক্তির দ্রুত বৃদ্ধি এবং জনগণের জীবনমানের ধারাবাহিক উন্নতির জন্য দরকার সরকারী মালিকানাধীন অর্থনৈতিক মূল ক্ষেত্রগুলির মাধ্যমে জনগণতান্ত্রিক সরকারের নির্ধারক ভূমিকা এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণকারী ও নির্দেশাত্মক ভূমিকা। জনগণতান্ত্রিক অর্থনীতি হবে বহুকাঠামোসম্পন্ন যেখানে মালিকানায় বিভিন্ন রূপ থাকবে এবং রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র থাকবে আধিপত্যকারী অবস্থায়। বিশ্ব অর্থনীতিতে বিরাট পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে দেশ দৃঢ়ভাবে তার স্বনির্ভরতার ভিত্তিকে জোরদার করার চেষ্টা চালাবে ও সেইসঙ্গে বিদেশ থেকে আনা অগ্রসর প্রযুক্তিকে ব্যবহার করবে।

৬·৬ শিল্প ও শ্রমিকদের ক্ষেত্রে :

আমাদের শিল্পের দুর্দশা কেবল কৃষকদের অত্যন্ত কম ক্রয়ক্ষমতার জন্যই নয়, উৎপাদনের প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই একচেটিয়া পুঁজিপতিদের শ্বাসরুদ্ধকারী কবজা, বিদেশী পুঁজির ক্রমবর্ধমান অনুপ্রবেশ এবং সাম্রাজ্যবাদী সংস্থাগুলির নানা ধরনের আধিপত্যও এর জন্য দায়ী। একচেটিয়া সংস্থার হাতে সম্পদের কেন্দ্রীভবন অর্থনৈতিক বিকাশকে বিকৃত করছে এবং ব্যাপক বৈষম্যের জন্ম দিচ্ছে। বিদেশী পুঁজির ওপর নির্ভরতা এবং আন্তর্জাতিক ফিন্যান্স পুঁজির নির্দেশাবলী শোষণের এবং বিকৃত বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি করে—যা জনগণের চাহিদা মেটাবে না। শিল্পের ক্ষেত্রে, তাই জনগণতান্ত্রিক সরকার নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে :

(i) শিল্পের বিভিন্ন ক্ষেত্রে, আর্থিক, বাণিজ্য ও পরিষেবার ক্ষেত্রে ভারতীয় ও বিদেশী সম্পদের কেন্দ্রীভবন ভেঙে দেবে ও একচেটিয়া কর্তৃত্বের অবসান ঘটাতে রাষ্ট্র কর্তৃক তাদের সম্পদ অধিগ্রহণসহ উপযুক্ত পদক্ষেপ নেবে।

(ii) আধুনিকীকরণ, গণতন্ত্রীকরণ, আমলাতান্ত্রিক কবজা মুক্ত, দুর্নীতি দূরীকরণ, কঠোর দায়বদ্ধতা স্থিরিকরণের মাধ্যমে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পগুলিকে শক্তিশালী করা হবে। এগুলিকে প্রতিযোগিতামূলক ও পরিচালনায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে, যাতে অর্থনীতির নেতৃত্বকারী অবস্থান রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র দখল করতে পারে।

(iii) উন্নত প্রযুক্তি সংগ্রহ ও উৎপাদন ক্ষমতার উন্নয়নের স্বার্থে নির্বাচিত ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগের অনুমতি দেওয়া হবে। অর্থনীতির সামগ্রিক স্বার্থে ফিন্যান্স পুঁজির চলাচল নিয়ন্ত্রিত করা হবে।

(iv) ঋণ, ন্যায্যমূল্যে কাঁচামাল যোগান দিয়ে এবং বাজারের সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পগুলিকে সাহায্য করা হবে।

(v) দেশে সুষম ও পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের লক্ষ্যে অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্র এবং বাজারকে নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয় সাধন করা হবে। বিদেশী বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করা হবে।

(vi) শ্রমিকদের জীবনধারণের মানের মৌলিক উন্নতিসাধন করা হবে। সেইজন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে :

(ক) জীবনধারণের উপযোগী মজুরি নির্ধারণ (খ) কাজের ঘণ্টার ক্রমান্বয় হ্রাস (গ) সর্বপ্রকার কর্মক্ষমতাহানি ও বেকারীর বিরুদ্ধে সামাজিক বীমা চালু করা (ঘ) শ্রমিকদের জন্য আবাসন (ঙ) গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ট্রেড ইউনিয়নের স্বীকৃতি, মজুরি নির্ধারণের যৌথ দরকষাকষির অধিকার এবং ধর্মঘটের অধিকারের স্বীকৃতি। (চ) শিশু শ্রমের উচ্ছেদ।

vii) শ্রমিক, কৃষক, কারিগরদের কর থেকে যথাসম্ভব রেহাই দেওয়া হবে ; কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যে স্তরভিত্তিক কর চালু করা হবে এবং সাধারণ মানুষের স্বার্থে কার্যকরভাবে একটি দরনীতি প্রয়োগ করবে।

৬·৭ বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে

বিশ্বশান্তি রক্ষা ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের গণতন্ত্রীকরণের সপক্ষে ও সাম্রাজ্যবাদী প্রভুত্ববাদের বিরুদ্ধে ভারত যাতে ন্যায়সঙ্গত ভূমিকা পালন করতে পারে সেই লক্ষ্যে জনগণতান্ত্রিক সরকার :

(i) মৈত্রী ও সহযোগিতার ভিত্তিতে সকল দেশের সাথে সম্পর্ক উন্নত করা হবে। এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার উন্নয়নশীল দেশগুলির সাথে সংহতি ও সম্পর্ককে জোরদার করবে। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির আধিপত্যবাদের মোকাবিলা করার জন্য দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতায় উৎসাহদান এবং জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলনকে পুনর্সঞ্জীবিত করা হবে।

(ii) সমাজতান্ত্রিক ও শান্তিকামী দেশগুলির সাথে বন্ধুত্বের ও সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তোলা হবে। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এবং গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের সপক্ষে সমস্ত সংগ্রামগুলিকে সমর্থন।

(iii) পারমাণবিক যুদ্ধ-হুমকির অবসান, পারমাণবিক অস্ত্রের সার্বিক নিরস্ত্রীকরণ, গণধ্বংসকারী সর্বপ্রকারের পারমাণবিক, রাসায়নিক, জৈবিক অস্ত্রের ধ্বংস এবং এগুলির পরীক্ষা ও উৎপাদন নিষিদ্ধকরণ, সমস্ত বিদেশী সামরিক ঘাঁটির বিলোপের দাবি, পরিবেশ ও জৈবিক ভারসাম্য রক্ষা ও সংরক্ষণের জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করবে জনগণতান্ত্রিক সরকার।

iv) পাকিস্তান, চীন, বাংলাদেশ, নেপাল, ভূটান, শ্রীলঙ্কা ও বার্মার মতো ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে বর্তমানে যেসব মতপার্থক্য ও বিরোধ রয়েছে তা শান্তিপূর্ণভাবে মেটাতে বিশেষ ও উদ্যমী প্রয়াস নেওয়া হবে, বন্ধুত্বের সম্পর্ককে জোরদার করা হবে। দক্ষিণ এশীয় সহযোগিতা বৃদ্ধির চেষ্টা করা হবে।

৭

জনগণতান্ত্রিক মোর্চা গঠন

৭.১ ভারতীয় বিপ্লবের মৌল কর্তব্যসমূহের সুসম্পূর্ণ ও সর্বাঙ্গীণ সমাধানের জন্য বর্তমান স্তরে বৃহৎ বুর্জোয়াবর্গের নেতৃত্বে পরিচালিত বর্তমান বুর্জোয়া-জমিদার রাষ্ট্রের বদলে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যিক কর্তব্য।

৭.২ বিকাশের বর্তমান স্তরে আমাদের বিপ্লবের প্রকৃতি মূলতঃ সামন্ততন্ত্র-বিরোধী, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, একচেটিয়া-বিরোধী ও গণতান্ত্রিক। আমাদের বিপ্লবের স্তর এই বিপ্লবকে জয়যুক্ত করার সংগ্রামে বিভিন্ন শ্রেণীর ভূমিকাকেও নির্ধারণ করে দেয়। বর্তমান যুগে সমাজতন্ত্র অর্জনের দিকে এগিয়ে যাবার আবশ্যিক সোপান হিসেবে শ্রমিকশ্রেণীকেই গণতান্ত্রিক বিপ্লবের নেতৃত্ব করতে হবে। তাই এটা বুর্জোয়াশ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত পুরনো ধরনের গণতান্ত্রিক বিপ্লব নয়। এ হচ্ছে নতুন ধরনের জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব যা সংগঠিত ও পরিচালিত হয়ে থাকে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে।

৭.৩ আমাদের কৃষির, সেই সঙ্গে শিল্পের উৎপাদিকা শক্তির উপর থেকে সামন্ততান্ত্রিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক অবশেষগুলির শৃঙ্খল ভেঙে ফেলার জন্য জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের সবচেয়ে প্রথম ও সবচেয়ে প্রধান কর্তব্য হলো কৃষক সমাজের স্বার্থে আমূল ভূমিসংস্কারের বাস্তব রূপায়ণ। এরই অনুপূরক কাজ হিসাবে সামাজিক ব্যবস্থার ব্যাপক রদবদল করতে হবে, কেননা এই সামাজিক

ব্যবস্থার মাধ্যমেই বর্ণভেদ ও অন্যান্য সামাজিক প্রথার মতো প্রাক্ ধনতান্ত্রিক সমাজের সব অবশেষগুলি যুগ যুগ ব্যাপী পশ্চাৎপদতার মধ্যে গ্রামকে বেঁধে রাখে। এই কর্তব্য কৃষি-বিপ্লবের সম্পূর্ণতা-সাধনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, কেননা বাস্তবিকপক্ষে কৃষি-বিপ্লবই হচ্ছে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের অক্ষস্বরূপ। জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের দ্বিতীয় জরুরী কর্তব্য হচ্ছে আমাদের জনগণের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনকে সাম্রাজ্যবাদ ও বহুজাতিক কর্পোরেশনের আধিপত্য এবং আন্তর্জাতিক একচেটিয়া পুঁজির বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সর্বনাশা প্রভাব থেকে মুক্ত করা। এরই সঙ্গে যুক্ত একচেটিয়া পুঁজির ক্ষমতাকে ভেঙে ফেলার কর্তব্য।

৭.৪ অবশ্য আজকের পটভূমিকায় রাষ্ট্র-নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত বৃহৎ বুর্জোয়াদের ও তাদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিদের দৃঢ়বদ্ধ বিরোধিতা না করে এবং তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম না গড়ে তুলে বিপ্লবের এই সমস্ত মৌল ও বুনিয়াদি কর্তব্য কাজে পরিণত করা যায় না। নিজেদের শ্রেণী-আধিপত্য সুরক্ষিত করার জন্য তারা জমিদারতন্ত্রের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ। বিদেশী একচেটিয়া মূলধনকে রক্ষা করার জন্য এবং তাকে আরো অব্যাহতভাবে অনুপ্রবেশের সুবিধা দেবার জন্য তারা আজ নিজেদের রাষ্ট্রক্ষমতাকে ব্যবহার করছে। অধিকন্তু তারা বিদেশী একচেটিয়া পুঁজির সঙ্গে আপস ও সহযোগিতা, বৃহৎ দেশীয় জমিদারতন্ত্রের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনের নীতি নিয়ে প্রবলভাবে ধনতান্ত্রিক বিকাশের পথ অনুসরণ করছে যার ফলে আমাদের দেশে একচেটিয়া পুঁজির অগ্রগতির পক্ষে বিপুল সুবিধা হচ্ছে। তাই জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব কেবল জমিদারতন্ত্রের ও বিদেশী একচেটিয়া ধনতন্ত্রের আপসহীন প্রতিপক্ষই নয়, এদের বিরোধিতা করার সঙ্গে সঙ্গে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব বৃহৎ বুর্জোয়াবর্গের বিরুদ্ধেও পরিচালিত — যে বৃহৎ বুর্জোয়াবর্গ রাষ্ট্রের নেতৃত্ব করছে এবং বিদেশী ফিন্যান্স পুঁজির সঙ্গে আপস ও সহযোগিতার নীতি এবং জমিদারতন্ত্রের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনের নীতি অনুসরণ করে চলেছে।

৭.৫ ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর ও তার রাজনৈতিক পার্টি — ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র নেতৃত্ব ছাড়া জনগণতান্ত্রিক মোর্চা সফলভাবে গঠন করা যায় না এবং এই বিপ্লব জয়যুক্ত হতে পারে না। ঐতিহাসিকভাবে আধুনিক সমাজে শ্রমিকশ্রেণী ছাড়া অন্য কোনো শ্রেণী এই ভূমিকা পালন করতে পারে না। আমাদের কালের সমগ্র অভিজ্ঞতা এই সত্যকে বারংবার প্রমাণ করে দিয়েছে।

৭.৬ জনগণতান্ত্রিক মোর্চার মৌলশক্তি ও ভিত্তি হবে শ্রমিক-কৃষকের দৃঢ় মৈত্রী। এই মৈত্রী হচ্ছে জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষার, সুদূরপ্রসারী গণতান্ত্রিক রূপান্তর সাধনের এবং সর্বাঙ্গীণ সামাজিক প্রগতি সুনিশ্চিত করার পক্ষে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ শক্তি। সেই সঙ্গে বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজে অন্যান্য শ্রেণীর ভূমিকা কী হবে, তা মুখ্যত শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর শক্তি ও স্থায়িত্বের ওপরেই নির্ভর করে।

৭.৭ কৃষিতে ধনতন্ত্রের গভীর অনুপ্রবেশ কৃষক সমাজের মধ্যে নির্দিষ্ট স্তরভেদ নিয়ে এসেছে। তাদের বিভিন্ন অংশ বিপ্লবে বিভিন্ন ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। কৃষিমজুর ও গরিব কৃষক হচ্ছে গ্রামীণ পরিবারগুলির বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এবং তারা জমিদারদের ও পুঁজিপতিদের দ্বারা নির্মমভাবে শোষিত। তারা হবে শ্রমিকশ্রেণীর মূল মিত্র। মাঝারি কৃষকও গ্রামাঞ্চলের তেজারতি মূলধনের, সামন্ততান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক জমিদারদের এবং বহুজাতিক কর্পোরেশন ও বৃহৎ বুর্জোয়া নিয়ন্ত্রিত ধনতান্ত্রিক বাজারের লুঠের শিকার হয়। গ্রামীণ জীবনে জমিদারদের আধিপত্য মাঝারি কৃষকদের সামাজিক মর্যাদার উপর এমন অসংখ্যভাবে আঘাত করে যে তারা জনগণতান্ত্রিক মোর্চার আস্থাভাজন মিত্রে পরিণত হয়।

৭.৮ কৃষক সমাজের একটি প্রভাবশালী অংশ হলো ধনী কৃষক। বুর্জোয়া-জমিদার কৃষি নীতিতে নিঃসন্দেহেই তাদের কিছু অংশ উপকৃত হয়েছে এবং স্বাধীনতা-উত্তর রাজত্বে তারা লাভবান হয়েছে। যেহেতু তারা নিজেদের খেতে কাজের জন্য ভাড়ায় কৃষিমজুর নিয়োগ করে তাদের ঝোঁক থাকে পুঁজিপতি-ভূস্বামী শ্রেণীর সঙ্গেই থাকা। কিন্তু ক্রমাগত দামের ওঠানামায় আক্রান্ত হয়ে এবং একচেটিয়া ব্যবসায়ী ও বহুজাতিক কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রণে থাকা বাজারের লুঠের শিকার হয়ে তারা বুর্জোয়া-জমিদার সরকারের বিরুদ্ধাচরণও করে। কোনো কোনো সময়সন্ধিক্ষণে তাদেরও জনগণতান্ত্রিক মোর্চায় নিয়ে আসা যায় এবং তাদের দোদুল্যমান চরিত্র সত্ত্বেও তারা জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবে ভূমিকা পালন করতে পারে।

৭.৯ পুঁজিপতি-জমিদার শাসনে শহর ও গ্রামের মধ্যবিত্ত শ্রেণী প্রচণ্ড দুর্দশা ভোগ করে। বিরাট অংশের মধ্যবিত্ত কর্মচারী, শিক্ষক, পেশাজীবী, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার ও বুদ্ধিজীবীদের নতুন সম্প্রদায় সমাজের উল্লেখযোগ্য ও প্রভাবশালী স্তর। ধনতন্ত্রের আরো অগ্রগতি ও উদারীকরণের নীতি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে বিভাজন গভীরতর করেছে। উচ্চ স্তরের একটি অংশ উপকৃত

হয়েছে এবং তাদের দৃষ্টিভঙ্গি মধ্যবিত্তের বাকি অংশের সঙ্গে মেলে না। তবুও জীবনের যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিসের ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধি, রাষ্ট্রের চাপানো ঊর্ধ্বগতি করের বোঝা, তীব্র বেকার সমস্যা এবং জীবনযাপনের মৌলিক সুযোগ-সুবিধার অভাবে মধ্যবিত্তের বিপুল অংশ আক্রান্ত। এইসব অংশ জনগণতান্ত্রিক ফ্রন্টে শরিক হতে পারে এবং হবেও। বিপ্লবের পক্ষে তাদের নিয়ে আসার জন্য সমস্ত প্রয়াস চালাতে হবে। গণতান্ত্রিক কর্মকাণ্ডের সপক্ষে এই অংশকে সমবেত করার কাজে প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা হলো গুরুত্বপূর্ণ।

৭.১০ শ্রেণী হিসাবে ভারতীয় বুর্জোয়াদের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের এবং সামন্তবাদী, আধা-সামন্তবাদী কৃষি ব্যবস্থার দ্বন্দ্ববিরোধ রয়েছে। কিন্তু বুর্জোয়াদের বৃহৎ ও একচেটিয়া অংশ স্বাধীনতার পরে রাষ্ট্র ক্ষমতায় তাদের আধিপত্যকে এই দ্বন্দ্ব বিরোধকে আপস, চাপ, দরকষাকষির মাধ্যমে মেটানোর কাজে ব্যবহার করে। এই প্রক্রিয়ায় এরা জমিদারদের সঙ্গে ক্ষমতা ভাগ করে নিয়েছে। এদের চরিত্র জনবিরোধী, কমিউনিস্ট বিরোধী এবং জনগণতান্ত্রিক ফ্রন্ট ও তার বিপ্লবী লক্ষ্যের এরা কট্টর বিরোধী।

৭.১১ অ-বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণী, যারা নিজেরা একচেটিয়া নয়, বৃহৎ বুর্জোয়া ও বিদেশী বহুজাতিকদের সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতার মুখে পড়ে। ধনতন্ত্রের সঙ্কট এবং বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলির বাধাহীন অনুপ্রবেশে তাদের সঙ্গে বিদেশী পুঁজির দ্বন্দ্ব তীব্রতর হবে। রাষ্ট্র কাঠামোয় তাদের আধিপত্যকারী অবস্থান এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতা ব্যবহার করে বৃহৎ বুর্জোয়ারা নিজেদের সঙ্কট সমাধানের চেষ্টা করে স্বশ্রেণীর দুর্বল সহোদরদের স্বার্থের বিনিময়ে। ফলে বুর্জোয়াদের এই অংশ রাষ্ট্রক্ষমতার সঙ্গে বিরোধিতার পথে যেতে বাধ্য হবে এবং জনগণতান্ত্রিক ফ্রন্টেও স্থান পেতে পারে। কিন্তু স্মরণে রাখা দরকার তারা এখনও বৃহৎ বুর্জোয়াদের সঙ্গে ক্ষমতা ভাগ করে আছে এবং এই ব্যবস্থাতেই আরও অগ্রগতির উচ্চাশা পোষণ করে। ভারতীয় বৃহৎ বুর্জোয়া ও সাম্রাজ্যবাদের তুলনায় তাদের শ্রেণী অবস্থান দুর্বল হওয়ার কারণে তাদের বস্তুগতভাবে প্রগতিশীল ভূমিকা থাকলেও তা স্থিতিশীল নয় এবং একদিকে বৃহৎ বুর্জোয়া ও বিদেশী পুঁজি অন্যদিকে জনগণতান্ত্রিক ফ্রন্টের মধ্যে তারা দোদুল্যমানতা দেখায়। এই দ্বৈত চরিত্রের জন্য, অস্থিতিশীল মিত্র হিসাবেও বিপ্লবে তাদের অংশগ্রহণ অনেকগুলি সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করবে। যেমন, শ্রেণীশক্তিসমূহের পারস্পরিক সম্পর্কের পরিবর্তন ; সাম্রাজ্যবাদ, জমিদারতন্ত্রের

সঙ্গে জনগণের দ্বন্দ্বের তীক্ষ্ণতা, বৃহৎ বুর্জোয়ার নেতৃত্বাধীন রাষ্ট্রের সঙ্গে বুর্জোয়াদের বাকি অংশগুলির দ্বন্দ্বের গভীরতার ওপর।

৭.১২ ধৈর্যসহকারে তাদের সমস্যাগুলিকে সুনির্দিষ্টভাবে অনুধাবন করেই গণতান্ত্রিক মোর্চায় তাদের নিয়ে আসার জন্য অবশ্যই সর্বতোভাবে চেষ্টা চালাতে হবে। ভারতীয় একচেটিয়া মালিক ও বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী প্রতিযোগীদের বিরুদ্ধে এদের সমস্ত লড়াইয়ে সমর্থনদানের কোনো সুযোগ হারানো শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে উচিত হবে না।

৭.১৩ জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের সাফল্যের জন্য জনগণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠনের মৌল লক্ষ্য এক মুহূর্তের জন্য বিস্মৃত না হয়েও এবং এই বিপ্লবকে অনিবার্যভাবেই বৃহৎ বুর্জোয়ার নেতৃত্বে পরিচালিত বর্তমান ভারতীয় রাষ্ট্রের সঙ্গে সংঘাতে আসতে হবে এ সম্পর্কে অবহিত থেকেও শ্রমিকশ্রেণী ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) বৃহৎ বুর্জোয়াসমেত ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী ও সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব ও বিরোধ রয়েছে, তার প্রতি লক্ষ্য রাখে। বহুজাতিক কর্পোরেশন ও বিদেশী ফিন্যান্স পুঁজির অবাধ, অনিয়ন্ত্রিত অনুপ্রবেশের জন্য ভারতীয় অর্থনীতিকে খুলে দেওয়ায় এই দ্বন্দ্ব আরো তীব্র হবে। এই প্রক্রিয়া সতর্কভাবে অনুধাবন করে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) এই জাতীয় সমস্ত পার্থক্য, ফাটল, সংঘাত ও দ্বন্দ্বকে সাম্রাজ্যবাদীদের বিচ্ছিন্ন করা ও গণতান্ত্রিক অগ্রগতির জন্য জনগণের সংগ্রামকে জোরদার করার কাজে ব্যবহার করার প্রয়াস চালাবে। দেশের প্রকৃত স্বার্থরক্ষা করে বিশ্বশান্তি ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার এমন সমস্ত প্রশ্নে, সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সংঘাত রয়েছে অর্থনীতি ও রাজনীতির এমন সমস্ত প্রশ্নে, আমাদের সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীন বৈদেশিক নীতিকে জোরদার করার সমস্ত প্রশ্নে সরকারকে অকুণ্ঠ সমর্থন জানাতে শ্রমিকশ্রেণী দ্বিধা করবে না।

৭.১৪ স্বাধীনতার পরেও প্রতিক্রিয়াশীল ও প্রতিবিপ্লবী প্রবণতাগুলি বিদ্যমান ছিল। সামন্তবাদী মতাদর্শের বিপুল প্রভাবের ফলে জনগণের পশ্চাৎপদতাকে তারা ব্যবহার করে। কিন্তু সাম্প্রতিক কয়েক দশকে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান অসন্তোষের কারণে সেই দলের ধারাবাহিক অবক্ষয় ঘটছে, কংগ্রেসের ছেড়ে যাওয়া শূন্যস্থান দখলের গুরুতর প্রচেষ্টা চালাচ্ছে ওই প্রবণতাগুলি। বিভেদকামী ও সাম্প্রদায়িক মঞ্চের ভারতীয় জনতা পার্টি একটি প্রতিক্রিয়াশীল দল। তাদের প্রতিক্রিয়াশীল মর্মবস্তুর ভিত্তি হলো অন্যান্য ধর্মের বিরুদ্ধে ঘৃণা, অসহিষ্ণুতা এবং উগ্র জাতীয়তাবাদী জাত্যভিমান। বি জে পি

কোনো সাধারণ বুর্জোয়া দল নয় কেননা ফ্যাসিস্ত ধাঁচের রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ তাদের পরিচালনা করে, আধিপত্য করে। বি জে পি ক্ষমতায় আসায় রাষ্ট্রক্ষমতা ও রাষ্ট্রযন্ত্রের বিভিন্ন সংস্থায় প্রবেশের সুযোগ পাচ্ছে আর এস এস। হিন্দুত্ব মতাদর্শ পুনরুত্থানবাদকে মদত দেয় হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ভারতের মিশ্র সংস্কৃতিকে প্রত্যাখ্যান করে। হিন্দুত্বের মতাদর্শ সাম্প্রদায়িকতাকে মদত দেয় এবং পরিণতিতে সংখ্যালঘু মৌলবাদের বিকাশেও সাহায্য করে। আমাদের রাজনৈতিক ব্যবস্থার ধর্মনিরপেক্ষ ভিত্তির ক্ষেত্রে এর গুরুতর প্রতিক্রিয়া রয়েছে এবং বাম ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পক্ষে তা গুরুতর বিপদ। সেইসঙ্গে বৃহৎ বাণিজ্য ও জমিদারদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন সাম্রাজ্যবাদ বি জে পি-কে সর্বাত্মক সমর্থন দিচ্ছে।

৭.১৫ এই সমস্ত ঘটনার ভিত্তিতে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) দেশের সমস্ত দেশপ্রেমিক শক্তির সঙ্গে, অর্থাৎ যারা প্রাক্-ধনতান্ত্রিক সমাজের সমস্ত অবশেষকে নিঃশেষ করতে চান, সর্বাঙ্গীণ এবং কৃষক স্বার্থে কৃষিবিপ্লব সম্পন্ন করতে আগ্রহী, যারা বিদেশী পুঁজির অনিয়ন্ত্রিত অনুপ্রবেশের বিরোধী এবং ভারতের অর্থনীতি, সামাজিক জীবন ও সংস্কৃতির আমূল পুনর্গঠনের পথে সমস্ত প্রতিবন্ধকতা দূর করতে আগ্রহী তাদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার কর্তব্যকে সামনে রাখছে।

৭.১৬ শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীকে মূলভিত্তি করে সমস্ত দেশপ্রেমিক ও গণতান্ত্রিক শক্তির বৈপ্লবিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের লক্ষ্যসমূহকে বাস্তবে রূপায়িত করা এক জটিল ও দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম। নানা অবস্থায় নানা পর্যায়ে এই সংগ্রাম পরিচালনা করতে হবে। এই বৈপ্লবিক আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন শ্রেণী ও একই শ্রেণীর বিভিন্ন বর্গ বিভিন্ন অবস্থান অবলম্বন করতে বাধ্য। একমাত্র একটি শক্তিশালী কমিউনিস্ট পার্টি যারা গণসংগ্রাম গড়ে তোলে এবং রণনীতিগত লক্ষ্য অর্জনে যথোপযুক্ত যুক্তফ্রন্টের রণকৌশল ব্যবহার করে, তারাই পারে এই অবস্থানের বিভিন্নতাকে ব্যবহার করে নিজেদের বাহিনীতে এই সমস্ত অংশকে টেনে আনতে। একমাত্র তেমন পার্টি সবচেয়ে আন্তরিক ও আত্মোৎসর্গকারী বিপ্লবীদের নিজের অভ্যন্তরে নিয়ে এসে বৈপ্লবিক সংগ্রামের পথে অনিবার্য নানা বাঁক ও মোড়ের মধ্যে দিয়ে জনগণের বিপুল অংশকে নেতৃত্ব দিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হবে।

৭.১৭ দ্রুত পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতির চাহিদা অনুসারে পার্টিকে নানান ধরনের অন্তর্বর্তীকালীন স্লোগান স্পষ্টতই বের করতে হবে। বর্তমান

শাসকশ্রেণীগুলিকে ক্ষমতাচ্যুত করে শ্রমিক-কৃষকের দৃঢ় মৈত্রীর উপরে প্রতিষ্ঠিত জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সরকার স্থাপনের কর্তব্যকে জনগণের সামনে অবিচল রেখেও, যদি তেমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যে, জনগণের সমস্যাবলী প্রশমনের এক কর্মসূচীতে অঙ্গীকারবদ্ধ কোনো সরকার প্রতিষ্ঠার সুযোগ রয়েছে, তা হলে পার্টি তেমন সুযোগের সদ্ব্যবহার করবে ও বর্তমান সীমাবদ্ধতার মধ্যে বিকল্প নীতিগুলি তুলে ধরা ও প্রয়োগ করার চেষ্টা করবে। এই ধরনের সরকারগুলি গঠনের ফলে শ্রমজীবী জনগণের বৈপ্লবিক আন্দোলন শক্তিশালী হবে, জনগণতান্ত্রিক মোর্চা গঠনের প্রক্রিয়াকে তা সাহায্য করবে। অবশ্য এই ধরনের সরকারগুলি দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যাবলীর মৌলিক সমাধান কোনভাবেই করবে না। তাই পার্টি সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতি অনুযায়ী রাজ্যগুলিতে অথবা কেন্দ্রে এই ধরনের সরকার গঠনের সুযোগ গ্রহণ করেও বর্তমান বৃহৎ বুর্জোয়ার নেতৃত্বাধীন বুর্জোয়া জমিদার রাষ্ট্র ও সরকারের অপসারণের আবশ্যকতা সম্পর্কে ব্যাপকতম জনসাধারণকে শিক্ষিত করতে থাকবে এবং এর দ্বারা গণ আন্দোলনকে শক্তিশালী করবে।

৭·১৮ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) শান্তিপূর্ণ উপায়ে জনগণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে এবং সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর ঘটাতে সচেষ্ট। একটি শক্তিশালী গণবিপ্লবী আন্দোলন বিকশিত করে সংসদীয় ও সংসদের বাইরে সংগ্রামী রূপের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে শ্রমিকশ্রেণী ও তার মিত্ররা প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির প্রতিরোধকে পরাজিত করতে এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে এইসব রূপান্তর সংঘটিত করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করবে। কিন্তু, এটা সব সময়েই মনে রাখা দরকার যে, শাসকশ্রেণীরা কখনো স্বেচ্ছায় তাদের ক্ষমতা ছেড়ে দেয় না। তারা জনগণের ইচ্ছাকে অস্বীকার করে, অরাজকতা ও হিংসার সাহায্যে তা উলটে দিতে চেষ্টা করে। সেজন্য বিপ্লবী শক্তিগুলির হুঁশিয়ার থাকা দরকার এবং এমনভাবে তাদের কাজকর্মের ধারা স্থির করা দরকার যাতে তারা সমস্ত রকম জরুরী পরিস্থিতির এবং দেশের রাজনৈতিক জীবনের যে কোনো বাঁক ও মোড়ের সম্মুখীন হতে পারে।

৮

কমিউনিস্ট পার্টিকে গড়ে তোলার কাজ

৮·১ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) জনগণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তার বৈপ্লবিক কর্মসূচী ভারতের জনগণের সামনে উপস্থিত করছে। জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব সমাজতন্ত্র ও শোষণমুক্ত সমাজের দিকে অগ্রগতির রাস্তা খুলে দেবে।

ভারতীয় জনগণের মুক্তির লক্ষ্যে এই বিপ্লব পরিচালনা করতে হবে শ্রমিকশ্রেণীকে, কৃষক সমাজের সঙ্গে মৈত্রীর ভিত্তিতে। এই লক্ষ্য অর্জনে শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রণী বাহিনী হিসাবে কমিউনিস্ট পার্টিকে সাম্রাজ্যবাদ, একচেটিয়া পুঁজিবাদ ও জমিদারতন্ত্রের বিরুদ্ধে জঙ্গী সংগ্রাম পরিচালনা করতে হবে। আমাদের দেশের সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের নীতি প্রয়োগ করে পার্টিকে রাজনৈতিক, মতাদর্শগত, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমস্ত ফ্রন্টে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম পরিচালনা করতে হবে, যতক্ষণ না বিজয় অর্জিত হয়।

৮·২ সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় হবার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদ তীব্র কমিউনিস্ট-বিরোধী প্রচার চালাচ্ছে। এর প্রেক্ষাপটে মতাদর্শগত সংগ্রাম তীব্র করা কমিউনিস্টদের অবশ্যকর্তব্য। শাসকশ্রেণীগুলির অন্যতম প্রধান মতাদর্শগত অস্ত্র হচ্ছে কমিউনিজম বিরোধিতা। কমিউনিস্টরা এর স্বরূপ উন্মোচন করে এর বিরুদ্ধে লড়াই করে। সামন্তবাদী ও বুর্জোয়া মতাদর্শের বিরুদ্ধে কমিউনিস্টরা ধারাবাহিক সংগ্রাম চালায় যাতে জনগণকে এই মতাদর্শের প্রভাব থেকে মুক্ত করা যায় এবং তাদের রাজনৈতিক চেতনার মান উন্নত করা যায়, সাম্রাজ্যবাদ পরিচালিত বিশ্বায়ন, উদারনীতি ও মুক্ত বাজার অর্থনীতির সওয়ালকারীদের প্রচারের মোকাবিলা করা যায়।

৮·৩ ধর্মীয় মৌলবাদ, কুসংস্কার, সাম্প্রদায়িকতা ও জাতপাত জনগণকে বিভাজিত করে এবং তাদের গণতান্ত্রিক চেতনার বিকাশকে পিছনে টানে। বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ ও উগ্র জাত্যভিমানের পাশাপাশি সাম্রাজ্যবাদী মদতপুষ্ট প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিকাশকে বিপর্যস্ত করতে এসবকে ব্যবহার করে। এইসব বিভেদকামী ধ্যানধারণা ও শক্তির বিরুদ্ধে কমিউনিস্টদের দৃঢ় সংগ্রাম পরিচালনা করতে হবে।

৮·৪ সমস্ত ফ্রন্টে সংগ্রাম চালাতে ও বিপ্লবী আন্দোলনকে পরিচালিত করতে গণবিপ্লবী পার্টি গড়ে তোলা প্রয়োজন। এমন পার্টিকে গণসংগ্রাম গড়ে তুলে এবং এরই সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণভাবে রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত প্রভাব সংহত করে জনগণের মধ্যে নিরন্তরভাবে ভিত্তি প্রসারের কাজ করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার ভিত্তিতে পরিচালিত শক্তিশালী, সুশৃঙ্খল পার্টি। শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমজীবী জনগণের সমস্ত অংশের প্রতি ঐতিহাসিক কর্তব্য পালনের লক্ষ্যে পার্টিকে নিজেকে ধারাবাহিকভাবে শিক্ষিত ও পুনর্শিক্ষিত করতে হবে, মতাদর্শগত-তত্ত্বগত মান পুনর্নবীকরণ করতে হবে, সাংগঠনিক শক্তি অর্জন করতে হবে।

৮.৫ জনগণতান্ত্রিক সরকার গঠন, তার কর্তব্যসমূহের সফল রূপায়ণ এবং জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব এটা সুনিশ্চিত করবে যে, ভারতীয় বিপ্লব গণতান্ত্রিক স্তরেই থেমে থাকবে না, উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ ঘটিয়ে সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের পর্বে পৌঁছে যাবে।

৮.৬ দেশের গণতান্ত্রিক অগ্রগতির যে লক্ষ্যে আমাদের জনগণ সংগ্রামরত তার একটি পরিষ্কার চিত্র যাতে তাঁদের সামনে থাকে সেই লক্ষ্যেই জনগণের সামনে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) এই কর্মসূচী পেশ করছে এবং আজকের দিনের প্রধান জরুরী কর্তব্য উপস্থিত করছে। প্রকৃত গণতান্ত্রিক বিকাশ ও সমৃদ্ধ জীবন গঠনে আগ্রহী শ্রমজীবী জনতা, শ্রমিকশ্রেণী, কৃষকসমাজ, মহিলা, ছাত্র, যুব, বুদ্ধিজীবী, মধ্যবিত্তশ্রেণীর কাছে আমাদের পার্টি এইসব কর্তব্য পালনে, লক্ষ্যপূরণে জনগণতান্ত্রিক ফ্রন্টে ঐক্যবদ্ধ হতে আহ্বান জানাচ্ছে ।

৮.৭ আমাদের জনগণের সংগ্রামী ঐতিহ্য ও আমাদের সভ্যতা-সংস্কৃতির যা কিছু সুন্দর ও মূল্যবান তাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)। সি পি আই (এম) দেশপ্রেমকে সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাবাদের সঙ্গে যুক্ত করে। সমস্ত কাজ ও সংগ্রামে পার্টি মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বৈজ্ঞানিক দর্শন ও নীতির দ্বারা পরিচালিত হয় যা একমাত্র পূর্ণাঙ্গ মুক্তির সঠিক নিশানা দেয়। মেহনতী জনগণের সবচেয়ে অগ্রণী, সবচেয়ে সক্রিয় ও সবচেয়ে নিঃস্বার্থ সন্তানদের পার্টি নিজের বাহিনীতে ঐক্যবদ্ধ করে এবং তাদের দৃঢ় মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ও সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাবাদী হিসাবে গড়ে তোলার নিরন্তর প্রয়াস চালায়। গণতান্ত্রিক বিকাশ ধারার জন্য সংগ্রামে সমস্ত দেশপ্রেমিক ও গণতান্ত্রিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করার কাজ, কর্মসূচীকে বাস্তবায়িত করার জন্য পরাক্রান্ত এক জনগণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠনের মহান কর্তব্যে পার্টি তার সমস্ত শক্তি ও সামর্থ্যকে নিয়োগ করছে।

৮.৮ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদ বিশ্বজোড়া আধিপত্যের চেষ্টা চালাচ্ছে। ভারতের অর্থনীতি, রাজনৈতিক ব্যবস্থা এমনকি সার্বভৌমত্বও বিপদের মুখে। এ হেন পরিস্থিতিতে এই আগ্রাসনকে সরাসরি ও সাহসের সঙ্গে মোকাবিলার জন্য সমস্ত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও প্রগতিশীল শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করার বড় কর্তব্য হাজির হয়েছে শ্রমিকশ্রেণী ও তার পার্টির সামনে। আমাদের বিপ্লবী কর্তব্য আমরা পালন করতে পারি কেবলমাত্র

সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাবাদকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরে, বিশ্বজুড়ে কমিউনিস্ট শক্তিগুলির মধ্যে উদ্দেশ্য ও কাজের ঐক্য গড়ে তুলে, বিপ্লবী সংগ্রাম পরিচালনা ও সমাজতন্ত্র নির্মাণে কমিউনিস্ট আন্দোলনের অভিজ্ঞতা থেকে যথাযথ শিক্ষাগ্রহণ করে, সমাজতন্ত্রকে যে আঘাত সহ্য করতে হয়েছে তার কারণ বিশ্লেষণ করে। দক্ষিণপন্থী সংশোধনবাদী এবং বামপন্থী সংকীর্ণতাবাদী বিচ্যুতির বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাবার অঙ্গীকার করছে সি পি আই (এম)। পার্টি জনগণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠন করতে শ্রেণীশক্তিসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক পরিবর্তনের সংগ্রামে ভারতীয় জনতাকে সমবেত করার কাজ এগিয়ে নিয়ে যাবে।

৮.৯ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস রাখে যে, শ্রমিকশ্রেণী ও তার বিপ্লবী অগ্রগামী বাহিনীর নেতৃত্বে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে আমাদের দেশের জনগণ এই কর্মসূচী বাস্তবে পরিণত করবেন। আমাদের পার্টি আস্থাবান যে, আমাদের মহান দেশ ভারতও একটি বিজয়ী জনগণতন্ত্ররূপে অভ্যুদিত হবে এবং সমাজতন্ত্রের পথে এগিয়ে যাবে।

একবিংশতিতম মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি, ২০১৭

প্রাপ্তিস্থান :
ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড
১২এ বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩

দাম : ১২ টাকা

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে চণ্ডী চক্রবর্তী কর্তৃক (মুজফ্ফর আহ্মদ ভবন), ৩১, আলিমুদ্দিন স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০১৬ থেকে প্রকাশিত এবং গণশক্তি প্রিন্টার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৩৩, আলিমুদ্দিন স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০১৬ থেকে মুদ্রিত।